রবীন্দ্রনাথ

মুহম্মদ মতিউর রহমান

রবীন্দ্রনাথ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ

মুহম্মদ মতিউর রহমান

প্রকাশনায়

বাংলা সাহিত্য পরিষদ

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ

মুহম্মদ মতিউর রহমান

প্রকাশনায়
বাংলা সাহিত্য পরিষদ
১৭১ বড় মগবাজার
ঢাকা - ১২১৭
টেলিফোন : ৯৩৩২৪১০
ISBN- 984-485-082-7
BSP-112-2004

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৪১১
মে ২০০৪
রবিউল আউয়াল ১৪২৫
বাসাপপ্র-১১২

গ্রন্থস্বত্ব
বেগম খালেদা রহমান
২৬/এ, আহম্মদ নগর
মিরপুর, ঢাকা - ১২১৬
টেলিফোন : ৯০০৫৩৮২

প্রচ্ছদ
রফিকুল্লাহ গাযালী

বর্ণ বিন্যাস
চৌকস প্রিন্টার্স লিমিটেড, ঢাকা

মুদ্রণ
নাবীল কম্পিউটার এণ্ড প্রিন্টার্স, ঢাকা

মূল্য
ষাট টাকা মাত্র।

Rabindranath by Muhammad Matiur Rahman published by Bangla Sahitya Parishad, 171 Baro Magbazar, Dhaka-1217. Price : Sixty taka only.

www.pathagar.com

উৎসর্গ

শহীদ অধ্যাপক আনোয়ার পাশার পবিত্র স্মৃতির স্মরণে

www.pathagar.com

সূচি

ভূমিকা– ৭

রবীন্দ্রনাথ– ৯

রবীন্দ্র-মানস ও আমরা– ৩৪

রবীন্দ্রনাথ ঃ বিশ্বকবি, নোবেল পুরস্কার, জাতীয় কবি প্রসঙ্গ– ৫৭

পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ– ৭৩

www.pathagar.com

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ একজন বড় কবি, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম। ছোটবেলা থেকেই পাঠ্যসূচীর বদৌলতে আমরা কমবেশী তাঁর সাথে পরিচিত। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বাংলা পড়ার সুবাদে এবং পরবর্তীতে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার কারণে তাঁর সম্পর্কে আমার জানাশোনার যথেষ্ট সুযোগ হয়েছে। তবে এ কারণে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমার পাঠ শেষ হয়েছে বা তাঁর সম্পর্কে সব জেনে ফেলেছি তা বলতে পারি না। বরং এ কথাই অকপটে স্বীকার করছি যে, পৃথিবীতে জানার কোন শেষ নেই। জীবনের শুরু থেকে শেষাবধি আমরা কেবল অজানাকে জানার চেষ্টায়ই নিয়োজিত থাকি। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও আমার একই কথা। বিশাল রবীন্দ্র-সাহিত্য আমার নিকট এখনো এক বিপুল বিস্ময়! তাঁর সম্পর্কে জানার মধ্যেও এক অফুরন্ত আনন্দ রয়েছে। সেই জানার কিছুটা কৌতূহল ও আগ্রহ সৃষ্টির প্রয়াস থেকেই এ গ্রন্থটি রচিত।

রবীন্দ্রনাথ যেমন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি, তাঁর সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যের অন্য সকল কবির তুলনায় আলোচনাও হয়েছে সর্বাধিক। আলোচনা-সমালোচনার ক্ষেত্রে পক্ষ-বিপক্ষ বা নানা মত ও যুক্তির অবতারণা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তা হয়েছে । এটাই স্বাভাবিক। এ গ্রন্থে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে একটি ভিন্ন বিষয়ের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রত্যেক কবি বা লেখকেরই একটি বিশেষ দর্শন, চিন্তা-চেতনা বা জীবনদৃষ্টি থাকে। লেখার মাধ্যমে বা সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে তাঁদের সেই দর্শন, চিন্তা-চেতনা বা জীবনদৃষ্টির প্রতিফলন ঘটে থাকে। আনন্দ দানের মাধ্যমে তাঁরা পাঠকের মনে তা সঞ্চারিত করে থাকেন। পাঠকের মনন ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিগঠনে তা বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। এভাবে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবনে এক অনিবার্য বাস্তবতা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। ফলে কেউ কেউ তাঁকে আমাদের সাহিত্যের সর্বাধিক বড় কবি বলার সাথে সাথে 'রবীন্দ্রনাথ আমাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ', এমনকি, 'রবীন্দ্র-সঙ্গীত ইবাদততুল্য' এরূপ আপত্তিকর উক্তি করে আমাদের ঈমান-আকীদা, ঐতিহ্য-সংস্কৃতি এমনকি, আমাদের স্বাধীন জাতিসত্তার ভিত্তিমূলে কুঠারঘাত করার অপচেষ্টা করেছেন। এ সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা যেমন দরকার, তেমনি আমাদের স্বাধীন জাতিসত্তা ও স্বতন্ত্র ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে আস্থাবান হওয়া ও তার যথাযথ চর্চা করার গুরুত্ব সীমাহীন।

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যের এক বৃহৎ ও অপরিহার্য অংশ। রবীন্দ্র-সাহিত্যও বাংলা সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ, কিন্তু তা আমাদের সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, ক্ষেত্র বিশেষে তা সাংঘর্ষিক। রবীন্দ্রনাথকে আমরা অবশ্যই পাঠ করবো, কিন্তু তাঁর স্বরূপ সম্পর্কেও আমাদের অবহিত হওয়া আবশ্যক। গ্রীক কবি হোমার, ইংরেজ কবি মিল্টন ও এলিয়ট সম্পর্কে একথা বলার অতটা প্রয়োজন পড়ে না, কারণ আমরা তাঁদের সাহিত্য পাঠ করি নিছক আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে, তাঁদেরকে আমরা কখনো আমাদের সংস্কৃতির অংশ বলে মনে করি না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভাষার কবি বলে তাঁর চিন্তা-দর্শনকেও আমাদের নিজস্ব বলে অর্বাচীনের মত ভাবতে শুরু করি। এক্ষেত্রে আত্ম-সচেতনতা ও স্বাজাত্যবোধই কেবল আমাদের অস্তিত্ব রক্ষায় সহায়ক হতে পারে।

মূলকথা, রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত একমাত্র কবি। কালজয়ী বহুমুখী প্রতিভার সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। তাঁর অসামান্য অবদানে বাংলা সাহিত্য বিশ্ব ভাষা-সাহিত্যের দরবারে গৌরবের আসনে সমাসীন, এজন্য যথাযোগ্য সম্মান তাঁর অবশ্যই প্রাপ্য। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, স্বতন্ত্র জাতিসত্তা ও জাতীয় আশা-আকাংক্ষার সাথে তাঁর কোন সম্পৃক্তি নেই। সেভাবেই তাঁর সাহিত্য পাঠ ও তা থেকে আনন্দ লাভ করা বাঞ্ছনীয়। এ গ্রন্থে সেই বিশেষ দিকটিই ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছি। এ চেষ্টা কতটা সফল হয়েছে, সুধি পাঠকই তা বিবেচনা করবেন।

পরিশেষে, বাংলা সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থটি প্রকাশ করায় আমি উক্ত প্রতিষ্ঠান ও তার কর্মকর্তাদের প্রতি সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

এ গ্রন্থটি আমার কলেজ-জীবনের শিক্ষক শহীদ অধ্যাপক মুহম্মদ আনোয়ার পাশার (পরবর্তীতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন) নামে পরম শ্রদ্ধার সাথে উৎসর্গ করেছি। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের একান্ত অনুরাগী পাঠক। তাঁর সঙ্গে আমি সবক্ষেত্রে একমত হতে পারতাম না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি আমার মনে যে কৌতূহল ও অদম্য আগ্রহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন তার স্বীকৃতিস্বরূপই তাঁর নামে গ্রন্থটি উৎসর্গিত হলো।

মুহম্মদ মতিউর রহমান

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) এক বিস্ময়কর প্রতিভা। তাঁর অবদানে বাংলা সাহিত্য যেমন নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে, বিশ্ব ভাষা-সাহিত্যের দরবারে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের মর্যাদাও তেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে। কবি হিসাবে তিনি সমধিক পরিচিত হলেও তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছিল সাহিত্য, সঙ্গীত, নাট্যকলা, চিত্রকলা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা যেমন কবিতা, প্রবন্ধ, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, গীতিনাট্য, চিত্রনাট্য, শিশুসাহিত্য, রম্যরচনা, পত্র-সাহিত্য, অনুবাদ, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা, বিশিষ্ট সুর ও ব্যঞ্জনার অভিব্যক্তি ও অর্থদ্যোতনার দিক থেকে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একটা স্বতন্ত্র, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিচয় সর্বজন স্বীকৃত। চিত্রশিল্পেও তাঁর অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এভাবে সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, নৃত্যকলা, নাট্যকলা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান তাঁকে এক অসাধারণ খ্যাতি ও মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। গুণগত ও পরিমাণগত উভয় দিক থেকেই এ সকল ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সুবিপুল ও নিরতিশয় বিস্ময়কর।

সাহিত্য ও শিল্পকলার যে ক্ষেত্রেই তিনি হাত লাগিয়েছেন সেটাই তাঁর অসাধারণ প্রতিভার কিরণ-স্পর্শে হয়েছে উজ্জ্বল, মহীয়ান। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ অসামান্য প্রতিভার আবির্ভাব নিতান্তই দুর্লভ। অথচ রবীন্দ্রনাথের যথাযথ মূল্যায়ন হয়েছে বলে মনে হয় না। ইংরেজী সাহিত্যে উইলিয়ম শেক্সপীয়রের উপর যত আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে, বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের উপর সে তুলনায় আলোচনা হয়েছে খুব কম। আবার যেটুকু হয়েছে তাও সর্বদা সাহিত্যালোচনার নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে হয়েছে বলে মনে হয় না। প্রায় ক্ষেত্রেই তা হয়েছে পক্ষপাতদুষ্ট। কখনো তা হয়েছে রবীন্দ্র-ভক্তিতে গদগদ আবার কখনো হয়েছে তা রবীন্দ্র-ঈর্ষায় জর্জরিত। উভয় ধরনের আলোচনাই অনেকটা একপেশে. রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল্যায়নে তা যথেষ্ট সহায়ক নয়। রবীন্দ্রনাথের যথার্থ মূল্যায়নে এ ধরনের আবেগ ও সংস্কার বর্জন একান্ত আবশ্যক।

যে কোন সৃষ্টিশীল প্রতিভাকে বুঝতে হলে তাঁর রচনা বা অবদানকেই অবলম্বন করতে হবে। সে সাথে সে প্রতিভার ব্যক্তি পরিচয়, পরিবেশ, অভিজ্ঞতা, জীবনবোধ ইত্যাদি সম্পর্কেও ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক। কেননা, এসবই সৃষ্টিশীল প্রতিভাকে তাঁর সৃষ্টি-কর্মে সর্বদা উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে থাকে। তাই কোন সৃষ্টিশীল প্রতিভাকে

www.pathagar.com

বোঝার জন্য সাধারণ মানুষের বিচার-বুদ্ধি সর্বদা পর্যাপ্ত বলে অনুভূত হয় না। সুধি সমালোচকরাই এ ব্যাপারে তাদের শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। অবশ্য চূড়ান্ত বিচারে, সৃষ্টিশীলদের সৃষ্টিকর্ম সাধারণ্যে সহজগ্রাহ্য, সহজ অনুভব্য ও সহজে সকলের মনকে নাড়া দিতে না পারলে তা জনপ্রিয় শিল্পকর্ম হিসেবে বিবেচিত হয় না। রবীন্দ্র-সাহিত্য এ চূড়ান্ত বিচারেও গ্রহণযোগ্যতার সকল মাপকাঠিতেই সহজেই উত্তীর্ণ হয়েছে।

তবু সমালোচকের ভূমিকা ও দায়িত্ব উপেক্ষা করা চলে না। রবীন্দ্র-সাহিত্যালোচনায় সুধি সমালোচক এ দায়িত্ব পালনে সর্বদা বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিতে সক্ষম হননি। রবীন্দ্র-সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রে কেউ অতিমাত্রায় রবীন্দ্রস্তুতি গেয়েছেন, কেউ রবীন্দ্র-ঈর্ষায় মাত্রাজ্ঞান হারিয়েছেন। মূলতঃ সাহিত্য মূল্যায়নে এর কোনটিই তেমন সহায়ক নয়। অবশ্য এ দু'ধরনের বিপরীত প্রান্তিক আলোচনায় ভিন্ন স্বাদের কিছু সত্য উদঘাটিত হয়, কিন্তু তার কোনটাই পূর্ণ সত্য নয়। পূর্ণ সত্য এ দু'য়ের মাঝামাঝি কোথাও অবস্থিত। ঈর্ষা ও আতিশয্য পরিত্যাগ করে বস্তুনিষ্ঠ মনোভাব নিয়েই যথার্থ সত্য আবিষ্কার করা সম্ভব।

সমাজতাত্ত্বিকদের মতে, বাঙালি স্বভাব-প্রবণতায় (এক্ষেত্রে বাংলাদেশী ও পশ্চিমবঙ্গীয় উভয়েই শামিল) বস্তুনিষ্ঠতার খানিকটা অভাব রয়েছে। বাঙালি স্বভাবের দু'টি প্রধান প্রবণতার মধ্যে একটি হলো উচ্ছ্বাস বা ভাবাবেগ অন্যটি হলো ঈর্ষাপরায়ণতা। প্রথমটির পরিচয় যেমন মধ্যযুগে রচিত বৈষ্ণব কাব্যের মধ্যে প্রবলভাবে বিদ্যমান; দ্বিতীয়টির পরিচয় তেমনি ঐ যুগে রচিত বিভিন্ন মঙ্গল কাব্যধারায় সুস্পষ্ট।

ঈর্ষাপরায়ণতার কারণে অনেক সময় অনেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন। সাহিত্য বিচারের চেয়ে তখন ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথই সমালোচকদের লক্ষ্য হয়েছেন। সাহিত্য বিচারে এরূপ অসহিষ্ণু মনোভাব ও স্পর্শকাতরতা কখনো গ্রহণযোগ্য কিংবা সুফলপ্রসূ হয় না। কিন্তু রবীন্দ্র-প্রতিভার উন্মেষ-লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত এরূপ বিদ্বেষপ্রবণ সমালোচনা মাঝে মাঝে আমাদের সাহিত্যাঙ্গণকে উত্তপ্ত করে তুলেছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ বা পশ্চিমবঙ্গ, হিন্দু-বৌদ্ধ বা মুসলিম কেউ ব্যতিক্রম নয়। যে কোন প্রতিভার পক্ষে এটাকে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিকও বলা যায় না। সমালোচনার ক্ষেত্রে পক্ষ-বিপক্ষ থাকাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তা আছে। এটাকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

অন্যদিকে, ভাবাবেগ বা উচ্ছ্বাসপ্রবণতাও আমাদের স্বভাবের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এটা প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কমবেশী বিদ্যমান। বড়কে অতি বড় করে দেখা, অনেক সময় অতিশয়োক্তি যোগ করে তাকে অতি-প্রাকৃত শক্তিতে পরিণত করা বা তার মধ্যে অলৌকিকত্ব আরোপ করা আমাদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। প্রতিষ্ঠিত ধারণা-বিশ্বাস ও সংস্কারকে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুসংস্কার) বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টি ও যুক্তিশীল মন দিয়ে বিচার

www.pathagar.com

করার প্রতি আমাদের স্বাভাবিক অনাগ্রহ এক্ষেত্রে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল। এ স্বাভাবিক বাঙালি স্বভাব-প্রবণতা রবীন্দ্র-সাহিত্য মূল্যায়নেও পরিলক্ষিত হয়। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রবীন্দ্র-চর্চা অতিরিক্ত ভাবাবেগপূর্ণ রবীন্দ্র-স্তুতিতে পর্যবসিত হয়েছে। এতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভক্তি-ভাবের প্রাবল্য প্রদর্শিত হলেও রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল্যয়নে তা যথেষ্ট সহায়ক নয়।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্য-গগনে সর্বাধিক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। সে হিসেবে তাঁর প্রতি আমাদের যথার্থ শ্রদ্ধা দেখাতে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়; কিন্তু তাই বলে ভক্তি-ভাবের বন্যায় সাহিত্য-বিচারে পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গী প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হওয়াও অনুচিত। বড়কে বড় করে দেখায় আনন্দ আছে, সহস্র ক্ষুদ্র উপাদানে যে বিরাটত্বের সৃষ্টি সে ক্ষুদ্রকেও উপেক্ষা করা চলে না। তাই বিশাল রবীন্দ্র-সাহিত্য মূল্যায়নে আমাদের সম্পূর্ণ নিস্পৃহ মন নিয়েই অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

রবীন্দ্র-সাহিত্যালোচনার পূর্বে ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা থাকা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের জন্ম জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে। রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ পঞ্চানন ঠাকুর তাঁর আদি নিবাস যশোর ত্যাগ করে গোবিন্দপুর এসে নতুন বাসস্থান নির্মাণ করেন। এর কিছুকাল পরেই গোবিন্দপুর, সূতানটি ও কালিঘাট এ তিনটি গ্রাম নিয়ে কলকাতা শহর স্থাপিত হয়। এ কলকাতা শহরের জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারেই ১৮৬১ সনে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষগণ ব্রাহ্মণ হিসাবে পরিচিত হলেও "ঠাকুর" পদবী ইংরেজ আমলে পঞ্চানন ঠাকুরই প্রথম লাভ করেন।

অন্য একটি ভিন্ন মত রয়েছে এ সম্পর্কে এবং তা হলো ঃ "খুবই সাধারণ অখ্যাত মানুষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ব পুরুষ। 'ঠাকুর' পদবিটাও বরাবর ছিল না। পূর্ব পুরুষ পঞ্চানন কুশারী শ্রমিকের কাজ করতেন। শ্রমিকদের মধ্যে কিছুটা মাতব্বর গোছের ভূমিকা পালন করায় সাধারণ শ্রমিকরা তাঁকে 'ঠাকুর মশাই' বলে ডাকতেন। ঐ 'ঠাকুর মশাই' থেকেই 'ঠাকুর' পদবিটি। পূর্ব পুরুষদের নামগুলোও ছিল মামুলি-আড়ম্বরহীন। যেমন-কামদেব, জয়দেব, রতিদেব ও শুকদেব ইত্যাদি। কামদেব ও জয়দেব পরবর্তীতে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। নতুন নাম হয় কামালুদ্দিন ও জামালুদ্দিন। যার কারণে রবীন্দ্রনাথের বংশকে একটা কলঙ্ক (?) বহন করতে হয়। তাঁরা ব্রাহ্মণ হলেও (পীর-ওলী থেকে) 'পীরালি ব্রাহ্মণ!' সেই যন্ত্রনা ঠাকুর পরিবারের দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথসহ কমবেশি অনেককেই ভোগ করতে হয়।" (শেখ মফিজুল ইসলাম ঃ ভিন্ন চোখে রবীন্দ্রনাথ।

পঞ্চানন ঠাকুরের পুত্র জয়রাম ঠাকুর চব্বিশ পরগণায় আমিনের কাজ করতেন। গোবিন্দপুরে কলকাতা শহর প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পঞ্চানন ও তৎপুত্র জয়রামের অধিকারভুক্ত জমি উচ্চ মূল্যে ক্রয় করলে তাঁরা বিপুল অর্থের মালিক

www.pathagar.com

হন। এছাড়া, ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণের ঠিকাদারীতে তাঁদের প্রচুর অর্থাগম ঘটে। ১৭৬২ সনে জয়রামের মৃত্যু হয়। তাঁর দুই ছেলে দর্পনারায়ণ ঠাকুর ও নীলমণি ঠাকুর। দর্পনারায়ণ ব্যবসা করে এবং নীলমণি আলিপুরের ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে সেরেস্তাদারী করে পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদ বহুগুণে বৃদ্ধি করেন। নীলমণির ছেলে দ্বারকানাথ ঠাকুর, ব্যবসা এবং সর্বশেষে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে প্রচুর বিত্ত-বৈভবের মালিক হন। দর্পনারায়ণও রাজশাহীর রাজার ২৪৯ বর্গমাইল বিস্তৃত জমিদারী ক্রয় করে নিজে জমিদার হন। তাঁর ছেলে গোপীমোহন পরে রাজশাহী, যশোর, দিনাজপুরে আরো জমিদারী ক্রয় করে তাঁর জমিদারী বিস্তৃত করেন। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ বহরমপুর ও কটকের জমিদারী লাভ করেন। পরে তিনিও হুগলী, রাজশাহী, মেদেনীপুর, রংপুর ও ত্রিপুরা জেলায় আরো জমিদারী হস্তগত করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বৈষয়িক। ইংরেজদের সঙ্গে সখ্যতার কারণে তিনি 'প্রিন্স' খেতাব লাভ করেন।

দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ পিতার মত অতটা বৈষয়িক ছিলেন না। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী ছাপাখানা, তত্ত্ববোধিনী সমাজ ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন এবং ধর্মচর্চা করে বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত করতেন। বিপুল বিষয়-বৈভবের মধ্যে তিনি লালিত-পালিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি ব্রহ্ম তত্ত্বজ্ঞানান্বেষণে কলকাতার কোলাহল ত্যাগ করে নির্জন পাহাড়-পর্বত ও দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে পিতা দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

"আমার জন্মের কয়েক বৎসর পূর্ব হতেই আমার পিতা প্রায় দেশভ্রমণেই নিযুক্ত ছিলেন। বাল্যকালে তিনি আমার কাছে অপরিচিত ছিলেন বলিলেই হয়।"

দেবেন্দ্রনাথ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও রাজা রামমোহন রায়ের নিকট উপনিষদ ও ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনায় সর্বদা নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। বিশেষত রামমোহনের প্রতি তিনি এত অনুরক্ত ছিলেন যে, তিনি ব্রহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্মতত্ত্বালোচনায় নিজেকে সর্বদা নিয়োজিত রাখেন। ফলে বিষয়-সম্পত্তির প্রতি তাঁর তেমন আকর্ষণ ছিল না। দেবেন্দ্রনাথ খুব ভাল ফারসী জানতেন। ফারসী সুফী কবিগণ তাঁর প্রিয় ছিলেন এবং তিনি তাঁদের বয়াত আবৃত্তি করে আনন্দ পেতেন।

রবীন্দ্রনাথ পিতার আদর্শে গড়ে উঠেছিলেন। পিতার মতোই তিনি ব্রাহ্মধর্ম ও সুফী দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হন। বেদান্ত ও সুফী দর্শন এবং সে সাথে বাংলার বাউলদের মরমীবাদ রবীন্দ্র-কাব্যে একাকার হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ স্কুল-কলেজে অধ্যয়ন করেননি। স্কুলে তিনি অল্প কিছুদিন পড়াশোনা করেছিলেন। কিন্তু স্কুলের বাঁধাধরা নিয়ম-কানুন ও বদ্ধ পরিবেশে তাঁর মন বসেনি। তাই স্কুলের পাঠ তাঁকে অল্পদিনে সাঙ্গ দিতে হয়েছে। স্কুলের শিক্ষা ও এর পরিবেশ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন ঃ

www.pathagar.com

"নর্মাল স্কুল ত্যাগ করিয়া আমরা বেঙ্গল একাডেমী নামক এক ফিরিঙ্গি স্কুলে ভর্তি হইলাম। ইহার ঘরগুলা নির্মম, ইহার দেওয়ালগুলা পাহারাওয়ালার মতো, ইহার মধ্যে বাড়ীর ভাব কিছুই নাই, ইহা খোপওয়ালা একটা বড় বাক্স।...ছেলেদের ভালো-মন্দো লাগা বলিয়া একটা খুব মস্ত জিনিষ আছে–বিদ্যালয় হইতে সেই চিন্তা একেবারে নিঃশেষে নির্বাসিত। সেই জন্য বিদ্যালয়ের দেউড়ি পার হইয়া তাহার সঙ্কীর্ণ আঙ্গিনার মধ্যে পা দিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সমস্ত মন বিমর্ষ হইয়া যাইত–অতএব ইস্কুলের সঙ্গে সেই পালাইবার সম্পর্ক আর ঘুচিলনা।"

স্কুলের পড়ায় যখন মন বসেনি, ঘরের পরিবেশে প্রাইভেট শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভে কোন বাধা ছিল না, বিত্তেরও কোন অভাব ছিল না। কিন্তু গৃহ-শিক্ষক সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের মন যে খুব প্রসন্ন ছিল না, তা তাঁর নিম্নোক্ত বর্ণনা থেকেই সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

"সন্ধ্যা হইয়াছে; মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে; রাস্তায় এক হাঁটু জল দাঁড়াইয়াছে।...মাষ্টার মহাশয়ের আসিবার সময় দু-চার মিনিট অতিক্রম করিয়াছে তবু এখনও বলা যায় না।...রাস্তার সম্মুখে বারান্দাটীতে চৌকী লইয়া গলির মোড়ের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি।...এমন সময় বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা যেন হঠাৎ আছাড় খাইয়া 'হা হতোস্মি' করিয়া পড়িয়া গেল। দৈবদুর্য্যোগে অপরাহত সেই কালো ছাতাটি দেখা দিয়াছে।...তাঁহার পড়াইবার সময় ছিল সন্ধ্যা বেলায় এবং পড়াইবার বিষয় ছিল ইংরাজী। সমস্ত দুঃখদিনের পর সন্ধ্যাবেলায় মিটমিটে বাতি জ্বালাইয়া বাঙ্গালী ছেলেকে ইংরেজী পড়াইবার ভার যদি স্বয়ং বিষ্ণুদূতের উপরেও দেওয়া হয় তবু তাহাকে যমদূত বলিয়া মনে হইবেই তাহাতে সন্দেহ নাই।"

এরপরেও রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত হয়েছিলেন প্রধানতঃ নিজের চেষ্টায় এবং তাঁর বাড়ীর উচ্চ সাংস্কৃতিক পরিবেশ-পরিমণ্ডলের কারণে। শিক্ষিত উচ্চবিত্ত ঠাকুর পরিবারে সাহিত্য-চর্চা, গান-বাদ্য-নাটকের চর্চা, ধর্ম-চর্চা ইত্যাদি হামেশাই চলতো। ঠাকুর পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও সেকালের কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও এতে অংশগ্রহণ করতেন। পুরুষানুক্রমে শাসক ইংরেজদের সাথে ঠাকুর পরিবারের বিশেষ সুসম্পর্ক থাকার কারণে অনেক ইংরেজের আনাগোনাও ছিল সে পরিবারে। এভাবে ঠাকুর পরিবারের পরিবেশ হয়ে উঠেছিল শিক্ষিত সংস্কৃতিবান উচ্চমহলের আধুনিক এবং কিছুটা বহুজাতিক একটি পরিবেশ। সে পরিবেশ থেকে রবীন্দ্রনাথ অনেক কিছুই শিখেছিলেন। তাই বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বহুলাংশে স্বশিক্ষিত এবং অংশতঃ তাঁর নিজস্ব পরিবেশের প্রভাবে পরিগঠিত স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্ব। তবে পরিবারের পরিবেশ-পরিমণ্ডল বিনির্মাণে দেবেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাব সর্বদা ক্রিয়াশীল ছিল। তিনি সরাসরি কাউকে শাসন করতেন না। তাঁর আদর্শ ও ব্যক্তিত্ব সকলকে আকর্ষিত ও অনুপ্রাণিত করতো। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকেই উদ্ধৃতি দিচ্ছি। তিনি লিখেছেন ঃ

www.pathagar.com

"ছোটো হইতে বড়ো পর্যন্ত পিতৃদেবের সমস্ত কল্পনা ও কাজ অত্যন্ত যথাযথ ছিল। হিমালয় যাত্রায় তাঁহার কাছে যত দিন ছিলাম একদিকে আমার প্রচুর পরিমাণে স্বাধীনতা ছিল, অন্যদিকে সমস্ত আচরণ অলঙ্ঘরূপে নির্দিষ্ট ছিল।"... "ভুল করিব বলিয়া তিনি ভয় পান নাই, কষ্ট পাইব বলিয়া তিনি উদ্বিগ্ন হন নাই। তিনি আমাদের সম্মুখে জীবনের আদর্শ ধরিয়াছিলেন কিন্তু শাসনের দণ্ড উদ্যত করেন নাই।"

রবীন্দ্রনাথের চরিত্র গঠিত হয়েছিল পিতা দেবেন্দ্রনাথের আদর্শে। তাঁর নিকট "ছোটো হইতে বড় পর্য্যন্ত পিতৃদেবের সমস্ত কল্পনা এবং কাজ অত্যন্ত যথাযথ ছিল"। এ থেকে বোঝা যায়, দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের অনুরক্ত ও ব্রাহ্মধর্মের অনুসারী হওয়ার কারণে পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন। এছাড়া, ফারসী ও মরমী কবিদের প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তিনি প্রায়ই তাঁদের আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ বয়েত গভীর আবেগের সাথে আবৃত্তি করতেন। রবীন্দ্রনাথও এর দ্বারা প্রভাবিত হন। পৌত্তলিকতার প্রতি দেবেন্দ্রনাথের বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হওয়ার প্রেক্ষাপট বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি নিজেই তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন ঃ

"Since my childhood I had been in touch with Rammohan Roy. I used to attend his school....I was the eldest son of my father. On any ceremonial occassion it was I who had to go from house to house in visiting people. It was the time of Durga pooja in the month of Aswin. I went to invite Rammohan Roy to this festival and said 'Rammoni Thakar begs to invite you to see the pooja for three days.' Upon this he said, "Brother, why come to me?... Now after all this lapse of time I understand the purpose and meaning of those words. Since then I inwardly resolved that Rammohan Roy did not take part in any image worship or idolatry so, would I not join in them either. I would not worship any image. I would not bow down before any image. I would not accept an invitation to any idolatrous poojah. From that time my mind was fully made mp.....I formed a party with my brother. We all resolved that we would not go to the sanctuary during the poojas and even if we went, none of us would bow down before the idol,"

ইরানের ফারসী কবিদের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাঁর 'Autobiography' এর ভূমিকা লিখতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

"In the latter part of 1902 Maharshi's health gave way and since then he was constantly ailing. During his last days, a favourite stanza

www.pathagar.com

of Hafiz was always on his lips : The bells is tolling, I have heard the call, and am ready to depart with all my luggage."

ফারসী মরমী কবিতা দেবেন্দ্রনাথের জীবন, ভাবলোক ও আধ্যাত্মিক চেতনা বিকাশে বিশেষ সহায়ক ছিল। রবীন্দ্রনাথ অনেকটা উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর নিজের জীবনেও এ দু'টি বিষয় অর্থাৎ পৌত্তলিকতার প্রতি বিরূপতা ও সুফী দর্শন বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। তাঁর 'গীতালি', 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলী' ইত্যাদি কাব্য রচনার পটভূমি এটাই। এক্ষেত্রে তাঁর জীবনে লালন শাহ-এর প্রভাবের কথাও উল্লেখ করা চলে। মূলতঃ লালনের দেহতত্ত্ব, মারফতী তথা বাউল দর্শনের মূল উৎসও ইরানী সুফীবাদ।

তবে এটাই শেষ কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু পুরাতত্ত্ব, বেদ-উপনিষদ পাঠ করেছিলেন এবং প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতির একান্ত অনুরাগী হিসেবে তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ছিল এটাই। তাঁর লেখাতেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, ব্রাহ্মধর্ম, সুফীবাদ, বাউল দর্শন, বেদান্ত দর্শন ইত্যাদির উপর আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতা-সাহিত্যের এক সমন্বিত প্রভাব-বলয়ের মধ্যেই রবীন্দ্র-মানসের জন্ম, পরিগঠন, অনুশীলন ও বিবর্তন সংঘটিত হয়। তাঁর মধ্যে কোন্‌টির প্রভাব বেশী বা কোন্‌টির কম সেটা নিরূপণ করা যেমন কঠিন, তেমনি সেটা রবীন্দ্র-সাহিত্যালোচনায় অত বেশি জরুরীও নয়।

রবীন্দ্রনাথের শৈশব, জীবন-পরিবেশ ও মানস-গঠন সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলার পর তাঁর সমকালে বাংলা সাহিত্যের অবস্থা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা আবশ্যক।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ যুগ-সন্ধিক্ষণে। ঐ সময়ে মধ্যযুগের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য কবি ঈশ্বরগুপ্তের মৃত্যু (১৮৫৯) এবং বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার প্রবর্তক মধুসূদনের 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য' প্রকাশিত হয় (১৮৬০)। তাঁর সমকালীন সাহিত্যিক পটভূমি আলোচনার পূর্বে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের উদ্ভব, বিকাশ ও ক্রম-বিবর্তন সম্পর্কেও কিঞ্চিৎ ধারণা থাকা আবশ্যক।

বৌদ্ধ পাল যুগকে বলা হয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি যুগ। এ যুগে বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটে এবং বাংলা কাব্যচর্চার সূত্রপাত ঘটে। তবে 'বৌদ্ধ গান ও দোঁহা' বা 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়' নামে খ্যাত সংকলিত পাণ্ডুলিপির অন্তর্ভুক্ত কয়েকজন কবির লেখা কয়েকটি কবিতা বা গান ব্যতিত এ যুগের অন্য কোন সাহিত্য-নিদর্শন পাওয়া যায়নি। বহিরাগত ব্রাহ্মণ সেন আমলকে নানা কারণে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে 'অন্ধকার যুগ' বলা হয়। এ যুগের রাজসভা ও সাহিত্যের ভাষা ছিল সংস্কৃত। তখন দেশীয় ভাষা বাংলার চর্চা ছিল নিষিদ্ধ। তাই এ সময় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের

www.pathagar.com

কোন চর্চা হয়নি। গ্রামাঞ্চলের সাধারণ জনগণের মধ্যে রাজরোষ এড়িয়ে গোপনে সাহিত্য চর্চা অব্যাহত থাকলেও তার কোন নিদর্শন সংগৃহীত বা সংরক্ষিত নেই।

দ্বিতীয় পর্যায়ে মুসলিম শাসনামলে (১২০৪-১৯৪৭) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা শুরু হয় এবং এটাকে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়। এ আমলের কয়েকজন প্রখ্যাত কবি হলেন ঃ বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, বলরাম দাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, বিপ্রদাস পিপলাই, ক্ষেতকী দাস, ক্ষেমানন্দ, বিজয়গুপ্ত, মানিক দত্ত, দ্বিজ মাধব, কবি কঙ্কন, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, শাহ মোহাম্মদ সগীর, মালাধর বসু, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, মোহাম্মদ কবীর, দৌলত উজির বাহরাম খাঁ, জৈনুদ্দিন, কবীন্দ্র পরমেশ্বর শ্রীকর নন্দী, ঘনশ্যাম দাস, সৈয়দ সুলতান, শেখ ফয়জুল্লাহ, সাবিরিদ খান, দৌলত কাজী, আলাওল, ভারতচন্দ্র প্রমুখ।

ইংরেজ আমলে (১৭৫৭-১৯৪৭) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটে দু'দিক থেকে। রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সাথে সাথে মুসলিম আমলে কবিরা যে রাজ-পৃষ্ঠপোষকতা পেতেন ইংরেজ আমলে তা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হয়ে সাহিত্যের আসন থেকে ছিট্‌কে পড়েন। দ্বিতীয়ত ১৮০০ সনে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করে কলেজের খৃস্টান পাদ্রী ও সংস্কৃত পণ্ডিতগণ বাংলা ভাষার সাধারণ রূপে পরিবর্তন সাধন করেন। বাংলা ভাষায় স্বী-কৃত আরবী-ফারসী-উর্দু-তুর্কী ভাষার অসংখ্য শব্দরাজি বাদ দিয়ে সংস্কৃত ভাষার দুর্বোধ্য, অপ্রচলিত শব্দরাজির দ্বারা নতুন সংস্কৃতবহুল বাংলা ভাষা চালু করে তার নাম দেয় 'সাধু বাংলা'। সে ভাষা এক শ্রেণীর হিন্দু সহজে অথবা সসংকোচে গ্রহণ করলেও অনেক হিন্দুই তা গ্রহণ করতে পারেনি। মুসলমানরা তো সে ভাষা মোটেই গ্রহণ করতে পারেনি। তাই ইংরেজ আমলে বাঙালি মুসলমান বাংলা ভাষা-সাহিত্যের চর্চায় অনেক পিছিয়ে যায়।

তবে ইংরেজ আমলে বাংলা গদ্য-রীতির চালু হওয়াটা ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অবশ্য বাংলা সাহিত্যিকদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪), প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর (১৮১৪-১৮৮৩), ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯), মধুসূদন দত্ত, (১৮২৪-১৮৭৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১), দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৪), রঙ্গলাল (১৮২৭-), গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১০), হেমচন্দ্র (১৮৩৮-১৯০৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪৩-১৯১০), মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১২), গোবিন্দ চন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮), মোহাম্মদ কাজেম অল কোরেশী ওরফে কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫১), শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১), শেখ রিয়াজ অল দীন মাশহাদী (১৮৬০-১৯১৯), মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩), মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য রত্ন (১৮৬০-১৯২৩), মুনশী মেহেরউল্লাহ (১৮৬১-১৯১৪) প্রমুখ। বয়সের দিক থেকে

www.pathagar.com

এঁরা সকলেই রবীন্দ্রনাথের অগ্রবর্তী কবি-সাহিত্যিক। এঁদের হাতে বাংলা কাব্য ও গদ্য-সাহিত্যের একটা ঐশ্বর্যময় বিকশিতরূপ আমরা লক্ষ্য করেছি। এঁদের মধ্যে ঈশ্বরগুপ্তকে মধ্যযুগের শেষ উল্লেখযোগ্য কবি এবং মাইকেল মধুসূদনকে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার উদ্বোধনকারী কবি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য' ১৮৬০ সনে প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যের এ বিশেষ যুগ-সন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথের জন্ম।

ইংরেজী ভাষা-সাহিত্য, শিক্ষা-সভ্যতার একনিষ্ঠ অনুসারী মধুসূদন পাশ্চাত্য আদর্শে বাংলা সাহিত্যকে প্রায় এককভাবে আধুনিকতার নতুন দিগন্তে এনে মর্যাদার আসনে সমাসীন করে দিলেন। মধুসূদনের এ কৃতিত্ব সর্বজনস্বীকৃত ও অনন্য। বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম এবং সার্থকতম মহাকাব্যের রচয়িতা। এক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ ছিলেন সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্লাসিক কবি হোমার ও জন মিল্টন। মধুসূদন তাঁদের রচিত মহাকাব্যের অনুসরণে তাঁর 'মেঘনদ বধ কাব্য' রচনা করেন। তিনি গ্রীক ট্রাজেডীর অনুসরণে বাংলায় প্রথম ও সার্থক কাব্য নাটক ও প্রহসন রচনা করেন। গ্রীক ও ইংরেজী সনেটের অনুসরণে তিনিই বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম ও সার্থকতম সনেটের রচয়িতা। ইংরেজী ব্ল্যাংক ভার্সের অনুসরণে তিনিই বাংলায় প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক। এভাবে মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার শুধু প্রবর্তকই নন; আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে তিনি বহু-মাত্রিক সম্ভাবনার এক নতুন দিগন্তে এনে দাঁড় করিয়ে গেছেন।

বাংলা কাব্যের এই সম্ভাবনাময় ও আলোকজ্জ্বল পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। তিনি ছিলেন মূলত গীতিকবি। এক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ ছিলেন কালিদাস, জয়দেব বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, শেলী, কীট্স, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ওমর খৈইয়াম, রুমী, হাফিজ প্রমুখ। তাঁর কাব্যের মূল সুর মানবতাবাদ, প্রকৃতিপ্রেম, মানবপ্রেম ও অধ্যাত্মবাদ। উপরোক্ত কবিদের কাব্যে এ সুর অনুরণিত, পরিব্যাপ্তিত। মধুসূদনের কাব্যে মানবতাবাদ ও দেশাত্মবোধের পরিচয় ফুটে উঠেছে। কালিদাস, চন্ডীদাস, বিদ্যাপতি, শেলী, কীট্স, ওয়ার্ডসওয়ার্থের মধ্যে প্রকৃতিপ্রেম ও মানবপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। রুমী, খৈয়াম, হাফিজের মধ্যে রয়েছে গভীর অধ্যাত্মপ্রেম। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ঘটেছে এ সবগুলোর এক আশ্চর্য সম্মিলন। এভাবে বাঙালি, ইরানী ও পাশ্চাত্য ভাবধারার একটি সমন্বয় ঘটেছে রবীন্দ্রনাথে।

আগেই উল্লেখ করেছি, রবীন্দ্রনাথ মূলত গীতিকবি। গীতিকবিতা অর্থে বুঝায় বিশেষ নিয়মে রচিত ছোট কবিতা। গীতি কবিতায় একটি বিশেষ ভাবের প্রকাশ ঘটে। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ মূলত এ ধরনেরই কবিতা। কানুপা বা কাহ্নপা, সরহপাদ প্রমুখ চর্যাপদ-কর্তাগণ সকলেই ছিলেন গীতিকবি। বিশেষ ধর্মীয় ভাব প্রকাশের জন্য তাঁরা যেসব কবিতা লিখেছেন, মূলত তা হলো গান এবং বৌদ্ধধর্ম-

www.pathagar.com

মন্দিরে বা অন্যত্র জনসাধারণ্যে তা গাওয়া হত। এ ভাবেই তার প্রচার চলত ও জনপ্রিয়তা সৃষ্টি হত। আদি যুগে পৃথিবীর সবদেশেই এভাবেই কবিরা তাঁদের সৃষ্টিকর্মের প্রকাশ ঘটাতেন। তখন ছাপাখানার প্রচলন ছিল না এবং লেখালেখির অভ্যাসও সাধারণ মানুষের মধ্যে এতটা ছিল না বলে এভাবে গানের আকারে ছোট ছোট কবিতা সৃষ্টি হয়ে যুথবদ্ধভাবে তা গীত হয়ে লোকসমাজে টিকে থাকতো।

ইউরোপে গীতিকবিতার সৃষ্টি হয় স্পেনীয় আরবদের অনুপ্রেরণায়। মোচাদেম নামে একজন অন্ধ আরব নবম শতাব্দীতে প্রথম লিরিক বা গীতি কবিতা রচনা করেন। তিনি যে সব কবিতা রচনা করেন তাকে বলা হতো Zejel বা গজল। এগুলো সম্পর্কে বলা হয়, 'Short, rhymed, made up of a number of stanzas in hemistiches'. এগুলো প্রায়ই পথে পথে গীত হতো, এর ভাবও খুব একটা উন্নত নয় বরং প্রায়ই তা অশ্লীলতাপূর্ণ। কিন্তু ইউরোপীয় লিরিক বা গীতিকবিতার সৃষ্টি হয় এভাবেই। জনৈক বিশিষ্ট লেখকের মতে ঃ And we can hardly doubt the immense part played in this by the Spanish Moslems. It was their example that was being followed in a feudal ambience."

আমেরিকা থেকে প্রকাশিত 'A New History of Spanish Literature' by Richard E. Chandler and kessel Scwartz গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

"The Arabs, a cultured people when the rest of Europe was still in a semibarbarous state, preceded the Provence Troubadours in achieving a professional status as poets and in the courtly concept of love. That there was intercourse between the Arabs states and the rest of Europe is wellknown. It seems plausible to conclude the provincial poets took a lesson from the Arabs, who were culturally more advanced, and that the origin of European lyric poetry was in Moslem Spain and not in southern France after all".

স্পেনীয় মুসলমানদের অনুকরণে ইউরোপে গীতিকবিতার উদ্ভব হলেও বাংলা সাহিত্যে তার প্রভাব পড়েছে বলে জানা যায় না। তবে আরবী সাহিত্য এবং ফারসী সাহিত্যের প্রভাব বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ থেকেই লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজ আমলে বাংলা সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে ইংরেজী সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে। মধুসূদন এ প্রভাবকে তাঁর দক্ষতার বলে সার্থক ও ইতিবাচকভাবে কাজে লাগিয়ে বাংলা সাহিত্যকে পুরাপুরি আধুনিক সাহিত্য করে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ এ আধুনিকতার ধারাকে আরো প্রাণবন্ত ও নানাভাবে সমৃদ্ধ করে তোলেন। বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতার যে প্রবহমানতা রবীন্দ্রনাথে এসে তা এক মহাবারিধির রূপ লাভ করে।

www.pathagar.com

প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা পেয়ে আসছে। তবে বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। উপন্যাসের কলারীতি অনুযায়ী বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিকের মর্যাদা পেলেও তিনি ছিলেন অতিশয় সাম্প্রদায়িক ও ঘোর মুসলিম-বিদ্বেষী। এ কারণে তিনি গোঁড়া হিন্দুদের নিকট ছিলেন 'ঋষী' হিসেবে পরিচিত। তারা তাঁকে 'সাহিত্য সম্রাট' উপাধিও প্রদান করে। সাম্প্রদায়িকতা দোষে-দুষ্ট বঙ্কিম নির্লজ্জভাবে ইতিহাস-বিকৃতি ঘটিয়ে মুসলমানদের ইতিহাস ও মুসলিম চরিত্রে কলংক লেপন করে এবং একই সাথে হিন্দুধর্ম, হিন্দুদের ইতিহাস ও হিন্দু-চরিত্রকে কাল্পনিকভাবে মহিমান্বিত ও উন্নত করে তুলে ধরে চরম মুসলিম-বিদ্বেষ ও তাদের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। ফলে উঁচু মানের প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি সর্বজনপ্রিয় হতে পারেননি। সাহিত্যের উদার মানবিক ক্ষেত্রকে তিনি সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন। ঐ সময় সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত এ প্রভাব সম্প্রসারিত হয় এবং বাংলার হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক চেতনা প্রবল আকার ধারণ করে। এ সাম্প্রদায়িক চেতনা পরবর্তীতে অনেক বড় বড় ব্যক্তি এমনকি, রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত প্রভাবিত করে–যার প্রমাণ তাঁর বহু রচনায় পরিলক্ষিত হয়। এ সত্ত্বেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলা উপন্যাসের মজবুত বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে বঙ্কিমের হাতেই। বঙ্কিমের পরে রবীন্দ্রনাথ বাংলা উপন্যাস সাহিত্যকে আরো সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করেছেন। বিশেষতঃ আধুনিক নর-নারীর জীবন-বৈচিত্র্য, পরিবেশ ও গভীর মনো-বিশ্লেষণাত্মক জীবনধর্মী উপন্যাসের স্রষ্টা বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই প্রথম।

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট ও উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশের সাথে জড়িত। মুসলিম শাসনামলেই বাংলা গদ্যের উদ্ভব। তবে তা চিঠি-পত্র ও দলিল-দস্তাবেজের মধ্যেই প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ ছিল। তখনো তা বইয়ের ভাষার রূপ পরিগ্রহ করেনি। তাই বলে এটাকে বাংলা গদ্যের আদি রূপ বলতে আপত্তি থাকা উচিত নয়। বাংলা গদ্যের এ আদিরূপে স্বভাবতই আরবী, উর্দু, ফারসী, তুর্কী শব্দের আধিক্য থাকায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীসহ অনেকেই এটাকে 'unreadable', 'অপাঠ্য কদর্য' ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু ইংরেজ আমলে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হলে (১৮০০ ঈসায়ী) কলেজের খৃস্টান ও হিন্দুদের দ্বারা নবউদ্ভাবিত যে সংস্কৃত বাংলা অর্থাৎ দুর্বোধ্য সংস্কৃত শব্দে আকীর্ণ বাংলা গদ্যে পাঠ্য-পুস্তকাদি চালু করা হয় তাও ছিল একান্ত 'unreadable' 'অপাঠ্য ও দুর্বোধ্য'। পণ্ডিতদের আবিষ্কৃত এ ভাষা সম্পর্কে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র বলেন ঃ

"আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি তাহা সংস্কৃত ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা

www.pathagar.com

কদাচ 'খয়ের' বলিতেন না 'খদির' বলিতেন। কদাচ 'চিনি' বলিতেন না 'শর্করা' বলিতেন।...'চুল' বলা হইবে না 'কেশ' বলিতে হইবে। 'কলা' বলিতে হইবে না 'রম্ভা' বলিতে হইবে।"

রবীন্দ্রনাথও এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ "বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের সূত্রপাত হইল বিদেশীর ফরমাসে এবং তার সূত্রধার হইলেন সংস্কৃত পণ্ডিত বাংলা ভাষার সঙ্গে যাদের ভাসুর ভাদ্র বৌয়ের সম্বন্ধ।"

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, রামরাম বিদ্যাবাচস্পতি, শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র, কাশীনাথ, পদ্মলোচন চূড়ামণি ও রামরাম বসু, তারিণীচরণ, চন্ডীচরণ, রাজীব লোচন, রামকিশোর, মোহনপ্রসাদ, কাশীনাথ তর্ক পঞ্চানন প্রমুখ ব্রাহ্মণ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ লিখিত পাঠ্য-পুস্তকাদি ছাত্রদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ করতে হয় বলে তাঁদের প্রবর্তিত 'সংস্কৃতবাংলা' (উদ্ভাবকেরা এর নাম দেন 'সাধুবাংলা') চালু হয় বটে কিন্তু দুর্বোধ্যতার কারণে তা কখনো জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। পরবর্তীতে রাজা রামমোহন রায় এ ভাষাকে বহুলাংশে গ্রহণীয় করে তোলেন। সেজন্য কেউ কেউ তাঁকে 'বাংলা গদ্যের জনক' বলেও অভিহিত করেন। এরপর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে অধিকতর সহজ ও প্রসাদগুণসম্পন্ন করে তোলেন। এরপর বাংলা গদ্যের আত্যন্তিক বিকাশ ঘটে বঙ্কিমচন্দ্র ও মীর মশাররফ হোসেনের হাতে। অন্যদিকে, বাংলা গদ্যের চলতি রূপের প্রকাশ ঘটে প্যারীচাঁদ, দীনবন্ধু মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখের হাতে আর প্রমথ চৌধুরীর হাতে তার পূর্ণ বিকশিত চলতি রূপের প্রকাশ ঘটে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যের এ বিকশিত রূপকে সৌন্দর্য-সুষমায় পূর্ণ করে তোলেন।

রবীন্দ্রনাথ সাধু এবং চলতি বাংলা গদ্যের উভয় রীতিতেই সাহিত্য চর্চা করেছেন। তাঁর গদ্যে সহজতা, লালিত্য, যুক্তিগ্রাহ্যতা ও কাব্যময়তার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের বাংলা গদ্য নানা কারণে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রত্যেক লেখকেরই প্রকাশভঙ্গী একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব। এ প্রকাশভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যই লেখকের সাফল্য নিরূপণের মাপকাঠি। রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে এ মানদন্ডে সগৌরবে উত্তীর্ণ। তাঁর গদ্যের ভাষা সাবলীল, প্রকাশভঙ্গী কাব্যাশ্রয়ী ফলে তা সকলকে বিস্ময়-পুলকে অভিভূত করে। বাংলা সাহিত্যে তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলার সাথে সাথে তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক হিসাবে চিহ্নিত করা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের খৃস্টান পাদ্রী ও সংস্কৃত পণ্ডিতেরা প্রচলিত বাংলা ভাষা থেকে আরবী-ফারসী-উর্দু-তুর্কী শব্দরাজি বাদ দিয়ে দুর্বোধ্য সংস্কৃত-শব্দরাজি আমদানী করে যে কৃত্রিম সংস্কৃত বাংলা গদ্যরীতির প্রচলন করেন সেটাকে তাঁরা 'সাধু বাংলা' বলে অভিহিত করেন। পরবর্তীতে ঐ সাধু গদ্যই রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মীর মশাররফ প্রমুখের হাতে বিবর্তিত-পরিমার্জিত হয়ে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথে এসে তা পূর্ণ পরিণত রূপ লাভ করে।

www.pathagar.com

অন্যদিকে, বাংলা গদ্যের চলতি রূপের যে পরিচয় প্যারীচাঁদে পরিলক্ষিত হয়, প্রমথ চৌধুরী তাকে সুষমামণ্ডিত করে আধুনিক গদ্যে রূপান্তরিত করেন। এজন্য প্রমথ চৌধুরীকে প্রথম দিকে আলোচনা-সমালোচনা ও অনেক বিপত্তির উত্তুঙ্গ পাহাড় ডিঙ্গিয়ে সাফল্যের স্তরে উত্তীর্ণ হতে হয়। প্রমথ চৌধুরী যে বাংলা চলতি গদ্যরীতির প্রবর্তন করেন সেটা মূলত কলকাতা, নদীয়া, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগরের অভিজাত হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখের ভাষাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা। এ কারণে সাধু ও চলতি উভয় বাংলা গদ্যরীতির সাথেই বাঙালি মুসলিম সমাজে প্রচলিত বাংলা ভাষার একটা দুস্তর ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এ প্রেক্ষাপটেই রবীদ্রনাথের আবির্ভাব। অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক–উপন্যাস, নাটক, মহাকাব্য, গীতিকবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তখন ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। একমাত্র মহাকাব্য ছাড়া উপরোক্ত সব শাখাতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হন। ছোটগল্প ও নাটকের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ নবতর সংযোজন ঘটিয়েছেন। মূলত বাংলা ছোটগল্পের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ। ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্যে রচিত ছোটগল্পের আদর্শে তিনি বাংলা ভাষায় সার্থক ছোটগল্প রচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ। এজন্য রবীন্দ্রনাথকে অনেকেই 'বাংলা ছোটগল্পের রাজা' বলে উল্লেখ করেছেন। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে মধুসূদন ও দীনবন্ধু মিত্র পথিকৃতের ভূমিকা পালন করলেও বাংলা নাট্য শাখাকে রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। এছাড়া, ভ্রমণ কাহিনী, জীবনস্মৃতি, পত্র-সাহিত্য ইত্যাদি ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অসাধারণ। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় এত অধিক ও বিচিত্র অবদান আর কারো নেই। রবীন্দ্রনাথ এদিক দিয়ে বলতে গেলে এক অসাধারণ প্রতিভা। বিশ্ব-সাহিত্যেও এরকম বহুমুখী প্রতিভা অতিশয় বিরল। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বিরাট হলেও তা বৈপ্লবিক নয়; সম্ভবত সর্বাংশে তা মৌলিকও নয়, মূলত তা অ্যাসেমিলিটিভ বা সমন্বয়বাদী।

বাংলাদেশ পলিমাটির দেশ। কোমলতা ও উর্বরতা এর বৈশিষ্ট্য। যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের লোক এসে বসতি স্থাপন করেছে এখানে এবং সে সঙ্গে তাদের ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ভাষা ও বিচিত্র জীবনাচরণ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে তারা। বাংলাদেশের কোমল প্রকৃতি, উদার আবহাওয়া ও উর্বর রসঘন মাটি সে সব সহজেই আত্মস্থ করে নিয়েছে। ফলে আবহমান কাল থেকে এখানে সমন্বয়ের একটি স্বতঃস্ফূর্ত ভাব লক্ষ্য করা গেছে। এজন্য বাঙালির মধ্যে মৌল প্রবণতার অভাব লক্ষ্য করা গেলেও উৎকর্ষের অভাব কখনো পরিলক্ষিত হয়নি। বিভিন্ন যুগে এখানে আর্য, জৈন, বৌদ্ধ, মুসলিম, পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি জাতির আগমন ঘটেছে এবং সে সঙ্গে তাদের স্ব স্ব ধর্ম, ভাষা, সভ্যতা, সংস্কৃতির প্রভাব রেখে গেছে অনার্য-অধ্যুষিত বাংলার উর্বর মাটিতে। উদার ও সমন্বয় স্বভাবের বাংলার প্রকৃতি সবকিছু আত্মস্থ করে নিজের পরিচয়

www.pathagar.com

ও পরিমণ্ডলকে আরো গভীর ও বিস্তৃত করে নিয়েছে। এ কারণেই বাংলাদেশ কোন মৌলিক দর্শন ও মতবাদের জন্ম দিতে পারেনি। বড় প্রতিভার আবির্ভাব ঘটলেও মৌলিক প্রতিভার জন্ম বাংলাদেশে হয়নি বললেই চলে। রবীন্দ্রনাথ এর ব্যতিক্রম ছিলেন না।

বাংলাদেশে এক সময়, জৈনধর্মের ব্যাপক প্রভাব ছিল, কিন্তু জৈনধর্ম বাংলাদেশের মাটির ফসল নয়, এর উৎপত্তি ঘটে পাঞ্জাবে। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কেও ঐ একই কথা, হিমালয় পাদদেশে এর উৎপত্তি। পরবর্তীতে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ঘটে। অনুরূপভাবে, হিন্দুধর্ম, ইসলাম, খৃস্টান ধর্ম প্রভৃতি প্রধান ধর্মের একটিও এ দেশের মাটিতে উদ্ভুত নয়। শংকরাচার্য, শ্রীচৈতন্য, রামানন্দ, রামমোহন, বিবেকানন্দ প্রমুখ দার্শনিক ও ধর্ম-সংস্কারকদের মধ্যেও কোন মৌলিক দর্শন বা মত নয়, বরং একটি সমন্বয়ের আদর্শই লক্ষ্য করা যায়। তাই বলা যায়, সমন্বয়-প্রবণতা বাঙালির ধর্ম, চিন্তা, ও কর্মে ব্যাপকভাবে প্রসারিত। এক্ষেত্রে একমাত্র ইসলাম বা বাঙালি মুসলমানগণ সর্বাংশে না হলেও বহুলাংশে একটা ব্যতিক্রম হিসেবে চিহ্নিত। ইসলামের চিরঞ্জীব শাশ্বত প্রাণসত্তা ও তৌহিদী চেতনাই এর মূল কারণ।

যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এ আবহমান বাঙালি স্বভাব তথা সমন্বয় প্রবণতাই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। হিন্দুধর্ম, খৃস্টান ধর্ম ও ইসলাম এর সমন্বয়ে গঠিত ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর আদর্শ। তাঁদের ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাধারা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। তাই বলছিলাম, রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য তাঁর প্রতিভার মৌলিকত্বে নয়; বরং তাঁর প্রতিভার অন্তর্নিহিত সমন্বয়-প্রবণতার গভীরতর বিস্তৃতি ও তার সার্থকতর রূপায়ণের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ শুধু দেশীয় সমন্বয় আদর্শকেই নয়, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের আদর্শকেও তিনি তাঁর সমন্বিত চিন্তা-চেতনায় ধারণ করেছেন। বিভিন্ন দেশের ভাব, চিন্তা, দর্শন, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নিজের মধ্যে ধারণ করে স্বীয় সাহিত্য-কর্মে তা প্রতিফলিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাই এত বিশাল হতে পেরেছেন, এত বিপুল ও বিচিত্র সৃষ্টি-কর্ম তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে তাঁর রচিত ছোটগল্প ও বিভিন্ন ধরনের নাটকের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। এ দু'টি ক্ষেত্রে তাঁর অভিনব এবং সার্থক অবদানের বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অনেক বিখ্যাত ছোটগল্প সমকালীন ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় রচিত বিভিন্ন সার্থক ছোটগল্পের অনুসরণে রচিত। তাঁর রচিত অনেক বিখ্যাত ছোটগল্প নেহায়েৎ ভাষান্তর মাত্র। তাই ছোটগল্পে তাঁর অসাধারণ অবদান সত্ত্বেও তাঁকে মৌলিক ও অভিনব অবদানের কৃতিত্ব দিতে তথ্যাভিজ্ঞগণ অনেকেই নারাজ। তাঁর রচিত কয়েকটি বিখ্যাত উপন্যাস সম্পর্কেও এ ধরনের অভিযোগ রয়েছে। অনুরূপভাবে, জার্মান ও রুশ সাহিত্যে তখন প্রতীকধর্মী নাটক, ব্যালে নৃত্য অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন

www.pathagar.com

করে এবং বিখ্যাত সব নাটক রচিত হয়। রুশ ব্যালে নৃত্যও জগৎ-জোড়া খ্যাতি অর্জন করে। রবীন্দ্রনাথ একাধিক বার ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করে বিপুল অভিজ্ঞতা ও এসব শিল্পকলার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করেন এবং বাংলা সাহিত্যে অনুরূপ নাটক রচনার প্রেরণা লাভ করেন। বিশ্ব-সাহিত্যের সাথে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় এবং সেটাকে সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তের মধ্যে এনে, তা থেকে ভাব, রস ও অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করে সার্থক সৃষ্টির যে অপরূপ দক্ষতা রবীন্দ্রনাথে লক্ষ্য করা যায়, তা সত্যিই বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথ তাই বাঙালি কবি হয়েও বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছেন। এ বিশ্বখ্যাতি তাঁর মৌলিকত্বের জন্য নয়, তাঁর অসাধারণ সমন্বয়বাদী প্রবণতা ও তাঁর যথার্থ সার্থক প্রয়োগ-কৌশল ও রচনা-শৈলীর জন্য।

রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্য লেখেননি, গীতিকবিতাতেই তিনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন। মূলত বাঙালিস্বভাবের যে আবহমান গীতি-প্রবণতা রবীন্দ্রনাথে এসে তা আত্যন্তিক বিকাশ ও সার্থক রূপ লাভ করেছে, এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ এবং পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য চরিতকাব্য, অনুবাদকাব্য প্রভৃতি সবই গীতিরসের প্রাবল্যে প্রাণময়। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে, এ গীতি-প্রবণতার সাথে ধর্মভাব এবং বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন-সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণ প্রায় অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। চর্যাপদে যেমন তা লক্ষ্যযোগ্য, বৈষ্ণবকাব্য, মঙ্গলকাব্য এমনকি, মুসলিম-রচিত বিভিন্ন কাহিনী কাব্যেও তা অতিশয় সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথেও এটা লক্ষণীয়। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে প্রখ্যাত বৈষ্ণব পদকর্তা বিদ্যাপতির অনুকরণে রচিত 'ভানুসিংহের পদাবলী' রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার উদ্গম কালের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন এবং তাঁর কাব্য-কীর্তির একটি বিশিষ্ট পরিচয় বহন করে। বৈষ্ণব পদাবলীর গীতিরস এবং দার্শনিক তত্ত্বই রবীন্দ্র-কবি-জীবনের মূলভিত্তি। প্রেমানুভূতির ক্ষেত্রে কবির মনে যে জ্বালা, চিত্তদাহ, না পাওয়ার মর্ম-বেদনা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এসবই বৈষ্ণব কাব্যের নায়িকা শ্রীমতি রাধিকার পরকীয়া প্রেমের দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ অতৃপ্ত মনের ব্যাকুলিত বাসনার প্রতিচ্ছবি মাত্র। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' 'সোনার তরী' 'চিত্রা' প্রভৃতি কাব্যে বৈষ্ণব কাব্যের ভাবানুভূতি ও আতপ্ত প্রেমের ব্যঞ্জনা অভিব্যক্ত। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট লেখক নীরদচন্দ্র চৌধুরীর একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

"রবীন্দ্রনাথের প্রেমের অনুভূতি কোথা হইতে আসিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। উহা প্রাচীন হিন্দুর অনুভূতি। সে নারীকে রাত্রিচারিণী, অভিসারিণী বলিয়া জানিত।" (নীরদচন্দ্র চৌধুরীঃ আত্মঘাতী বাঙ্গালী, পৃঃ ৮৪)।

ডক্টর সুকুমার সেনও প্রায় অনুরূপ কথাই বলেছেন। তাঁর ভাষায় ঃ

'রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম ভাবনা তাঁহার নিজস্ব। তবে ভাবনা ভারতীয় অধ্যাত্ম ঐতিহ্যের মূলাশ্রয়ী। সে মূলের দুইটি শাখা। এক. উপনিষদের আনন্দ দর্শন; দুই. বৈষ্ণব সাধনার লীলাবাদ।" (ডক্টর সুকুমার সেনঃ রবীন্দ্রনাথ, পৃষ্ঠা-৯)।

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলী', 'গীতালী,' 'গীতিমাল্য' প্রভৃতি কাব্যে ইরানী সুফীবাদের প্রভাব সুস্পষ্ট। ইরানী বিশ্ব-বিখ্যাত সুফী কবিগণ, বিশেষত হাফিয রবীন্দ্রনাথের একজন প্রিয় কবি। তিনি হাফিজের কয়েকটি কবিতা বাংলায় ভাষান্তরিত করেন। অন্যদিকে, তাঁর 'বলাকা' কাব্যকে ইউরোপীয় জীবনবাদ ও শিল্প-বিপ্লবোত্তর গতিবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব-সঞ্জাত বলে গণ্য করা চলে। সমন্বয়বাদী রবীন্দ্র-প্রতিভা একাধারে এ বিভিন্নমুখী প্রভাবকে ধারণ ও আত্মস্থ করে বাংলা কাব্যের বিচিত্র ভুবনে সক্ষম পদচারণা করেছে। জনৈক সমালোচকের ভাষায় ঃ

"চৌদ্দ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া বাইশ বৎসর বয়স পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ অপরকে অনুকরণ করিয়াই নিজের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। অপরের উপদেশ বা আদেশও তাঁহাকে নানাভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। কিন্তু আত্মপরিচয় লাভ ঘটে নাই, তাঁহার ভিতরের বিশিষ্ট কবি তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার অজ্ঞাত। তখনও তিনি নিজের 'হৃদয় অরণ্যে' বাহির হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় 'কারণহীন আবেগ' ও 'লক্ষ্যহীন আকাঙ্ক্ষা' লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। সেই আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা, হৃদয় অরণ্য হইতে মুক্ত হইয়া কল্পনা, রূপ ও রসে ভরপুর হইয়া অপূর্ব গতিবেগে বিশ্বের বহিরাঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িল।" (নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান ঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস, তৃতীয় প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৯২, পৃঃ ৫৪৪-৪৫)।

প্রশ্ন হলো, রবীন্দ্রনাথ কি অন্যকে 'অনুকরণ' করার প্রাথমিক কবি-জীবনের এ প্রবণতা থেকে কখনো মুক্ত হতে পেরেছেন? দেশী-বিদেশী ভাব, চিন্তা, দর্শন ও সাহিত্যকে তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও স্বাভাবিক স্বীকরণ প্রবণতা বা আত্মস্থ করার শক্তি দিয়ে নতুনভাবে অপরূপ সাহিত্য-আভরণে সুসজ্জিত করে তিনি আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন। অর্থাৎ মৌলিক কাব্য-প্রতিভার চেয়ে সমন্বয়বাদী প্রবণতাই সৃষ্টি-কর্মে তাঁকে সর্বদা বেশি উদ্বুদ্ধ করেছে। তাই আমাদের ধারণা, মৌলিক প্রতিভা হিসাবে নয়, সমন্বয়বাদী কবি-প্রতিভা হিসাবেই রবীন্দ্র-প্রতিভার আত্যন্তিক বিকাশ ও সে হিসাবেই তাঁর প্রতিভার প্রকৃত মূল্যায়ন যুক্তিযুক্ত।

কোন কবি বা শিল্পীই তাঁর পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন নন। রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসও গড়ে উঠেছে তাঁর নিজস্ব পরিবেশকে কেন্দ্র করে। কবির পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে সমকালীন ইতিহাস সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা থাকা আবশ্যক।

১৭৫৭ সনে পলাশী যুদ্ধের পর বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় ইংরেজ শাসন কায়েমের পর আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে ইংরেজদের আধিপত্য কায়েম হয়। সে সাথে ইংরেজী ভাষা-শিক্ষা-সভ্যতাও প্রবেশাধিকার পায় এদেশে। ফলে ইউরোপীয় প্রাণের সাথে বাঙালি প্রাণের মিলন ঘটে। বাঙালির সনাতন জীবনধারায় ইউরোপীয় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকরশ্মির উজ্জ্বলধারা সংমিশ্রিত হয়ে এক

www.pathagar.com

নবতর জীবন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়। এ পরিবর্তন বা বিবর্তনের সমন্বিত ধারায় হিন্দুরা ইংরেজদের দোসর হবার সুবাদে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-প্রশাসনিক ফায়দা হাসিলের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সামাজিক অন্যান্য ক্ষেত্রেও তারা নানাবিধ ফায়দা হাসিলের মাধ্যমে দ্রুত উন্নতির সোপান বেয়ে এগিয়ে যায়।

মুসলমানদের ক্ষেত্রে ঘটল ঠিক এর বিপরীতটা। পলাশী বিপর্যয়ের পর রাজনৈতিক পরিবর্তনকে তারা মেনে নিতে পারে নি। ফলে অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে তাদের অধঃপতন দ্রুত ও অনিবার্য হয়ে ওঠে। এছাড়া, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক সকল ক্ষেত্রে হিন্দুদের উন্নতি হয় মূলতঃ মুসলমানদের বঞ্চিত করার মাধ্যমে। শিক্ষা-সাহিত্য ও সামাজিক অন্যান্য ক্ষেত্রেও মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার কারণ হলো তাদের প্রতি ইংরেজ ও হিন্দু উভয়ের বৈরী মনোভাব। তাই উনবিংশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই বাঙালি হিন্দুর নবজাগরণের সূচনা হলেও মুসলমান সমাজে উন্নতি-অগ্রগতি ও নবজাগরণের ছোয়া লেগেছে এর প্রায় অর্ধশতাব্দী পর, মহাবিদ্রোহ বা সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭) ব্যর্থতা বরণের পর।

রামমোহন রায়, ঈশ্বর গুপ্ত, দেবেন্দ্রনাথ, প্যারীচাঁদ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ বাঙালি হিন্দুর নবজাগরণে স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। এঁদের মধ্যে রামমোহনকে হিন্দু নবজাগরণের প্রাণপুরুষ রূপে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি যদিও ইসলাম, খৃস্টানধর্ম ও হিন্দুধর্মের সমন্বয়ে 'ব্রাহ্মধর্ম' নামে এক নতুন ধর্মমতের প্রবর্তন করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল কুসংস্কারগ্রস্ত হিন্দু-সমাজের পুনরুত্থান। রামমোহন কোন ব্রাহ্ম-মন্দির স্থাপন করেননি, তাঁর একান্ত অনুগামী দেবেন্দ্রনাথই প্রথম ব্রাহ্ম-মন্দির স্থাপন করেন। তাঁরা উভয়েই হিন্দু-সমাজের উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। অন্যদিকে, সনাতনপন্থী হিন্দুদের মধ্যে পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও উদার দৃষ্টিতে হিন্দু-সমাজের সংস্কার কাজে আত্ম-নিয়োগ করেন। তাঁদের সকলের চেষ্টাতেই শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সামাজিক অন্যান্য ক্ষেত্রে হিন্দুরা বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে এগিয়ে আসে। তবে এ নবজাগরণের চাঞ্চল্য হিন্দু সমাজে একদিকে যেমন কিছুটা উশৃংখলতার যেমন জন্ম দেয়, তেমনি মুসলিম-বিদ্বেষের বীজও বপন করে। স্বজাতিকে জাগাতে হলে প্রতিপক্ষ মুসলিম জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করা যেন এ সময় অনেক হিন্দু-সমাজপতি অপরিহার্য জ্ঞান করেন। এ প্রসঙ্গে ইংরেজ লেখক W.W. Hunter ১৮৭২ সনে লিখেছেন ঃ

"The truth is, that our system of public instruction, which has awakened the Hindus from the sleep of centuries, and quickened their inert masses with some of the noble impulses of a nation, is opposed to the tradition, unsuited to the requirements, and hateful to the religion of Musalmans."

www.pathagar.com

ফলে হিন্দু নবজাগরণ এ সময় ত্রিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, প্যারীচাঁদ, ঈশ্বরচন্দ্র প্রমুখ হিন্দুধর্ম সংস্কারের মাধ্যমে আধুনিক যুগ ও পরিবেশের প্রেক্ষাপটে হিন্দু সমাজকে জাগরণের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন।

অন্যদিকে, পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার সাথে হিন্দুধর্মের যে সংঘাত বাঁধে তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মাইকেল মধুসূদনদের জন্ম হয়। মধুসূদন বা তাঁর সমগোত্রীয়গণ হলেন হিন্দু-সমাজের বিদ্রোহী সত্তা। হিন্দু সমাজে যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তারা প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। অনেকে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার প্রভাবে উশৃংখল হয়ে পড়ে। এ শ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দুরা মদ খেয়ে, নৈতিকতার বন্ধন ছিন্ন করে নারী-পুরুষে অবাধ মেলামেশা শুরু করে, খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করে এক নতুন ইঙ্গ-বঙ্গ সংস্কৃতির জন্ম দেয়। এঁদেরকে দ্বিতীয় ধারার অন্তর্ভুক্ত মনে করা যেতে পারে।

তৃতীয় ধারার প্রধান প্রাণপুরুষ হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। মুসলিম-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, মুসলমানদের ইতিহাস বিকৃত করে, মুসলমানদের চরিত্রে কলংক লেপন করে, কাল্পনিক হিন্দু-মাহাত্ম্য বর্ণনা করে হিন্দু নবজাগরণের প্রয়াসে লিপ্ত হন বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর ভাবশিষ্যরা। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা এদেরই অনুসারী ছিলেন।

বঙ্কিম চেয়েছিলেন, ইউরোপীয় সভ্যতার আলোকে বাঙালি হিন্দুর আদর্শ, ঐতিহ্য ও জীবন-পরিণামকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে। বঙ্কিমের এ স্বদেশ ও স্বাজাত্য-প্রীতি তৎকালীন হিন্দু-সমাজে এত বেশী আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল যে, বঙ্কিমকে তারা 'সাহিত্য-সম্রাট', 'ঋষি' ইত্যাদি অভিধায় বিশেষিত করে তাঁকে নবজাগরণের অগ্রদূত হিসাবে বরণ করে নেয়। সমকালীন অধিকাংশ হিন্দু লেখক ও সমাজপতিগণ সাহিত্য-চিন্তা ও সমাজ-উন্নয়নে বঙ্কিমের ভাবশিষ্য ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে উপরোক্ত প্রথম ধারার প্রভাব সর্বাধিক হলেও তাঁর মানস-ভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্রীয় ভাবধারার একটি বিক্ষিপ্ত প্রভাব কখনো কখনো স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে। মূলত প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত ধারার সমন্বয় সাধনের প্রয়াস রবীন্দ্রনাথের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ পৌরাণিক হিন্দুত্বের সাথে আধুনিক ব্রাহ্মধর্মের সুসঙ্গস মিলন ঘটাবার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি তৎকালীন হিন্দু নবজাগরণের প্রাণ-চাঞ্চল্য ও সনাতন হিন্দু-চৈতন্যকে তাঁর জীবন-বেদ্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। উপনিষদের দার্শনিক ভিত্তিতে পাশ্চাত্য ভাবধারার সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে তিনি এক নতুন জীবন-চৈতন্য নির্মাণে যত্নবান হন। তবে বিভিন্ন বিদেশী প্রভাব সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে বাঙালিত্ব ও হিন্দুত্বের পরিচয়ই মুখ্য হয়ে ওঠে এতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর সাহিত্য ও সৃষ্টিকর্মে সর্বত্র এ পরিচয় অতিশয় সুস্পষ্ট। এভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালীন পরিবেশের প্রভাবকে ধারণ করে স্বকীয় সাহিত্যের বিশাল ভুবন রচনা করেছেন।

www.pathagar.com

এটাকে অস্বাভাবিক বলা যায় না। প্রত্যেক কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকই অনেকাংশে তার নিজস্ব পরিবেশের সৃষ্টি। ইংরেজ নাট্যকার সেক্সপীয়রের বিশ্বজোড়া খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা। কিন্তু তিনি কি স্বীয় আঞ্চলিক প্রভাব ও পরিবেশের উর্ধে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন? মূলত কোন যথার্থ সৃজনশীল ব্যক্তির পক্ষেই তা সম্ভব নয়। মধুসূদন পাশ্চাত্য প্রভাবের মোহজালে বন্দী হয়ে স্বধর্ম পরিত্যাগ করলেও, ইংরেজী ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতির প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্য-চর্চার ক্ষেত্রে নিজ মাতৃভাষা, জন্মভূমি ও স্বজাতির ঐতিহ্য ও ভাবধারার সনাতন আবহের মধ্যেই ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। এছাড়া, যে কোন প্রতিভার সার্থক বিকাশ অন্য কোনভাবে সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথও অন্য ভাষায় লিখেছেন, তাঁর 'গীতাঞ্জলী' কাব্যের ইংরেজী অনুবাদ তিনি নিজেই করেছেন তবু এটা নিঃসন্দেহ যে, তাঁর প্রতিভার যথার্থ বিকাশ ঘটেছে তাঁর মাতৃভাষায়, অন্য সভ্যতা-সংস্কৃতি-সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাঁর সৃষ্টিকর্মের অন্ত:সলিলা প্রবাহিত হয়েছে হিন্দুধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অববাহিকার গভীর অন্তরালেই। তাই বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মুসলমানদের সম্পর্কে তিনি কিছু লেখেননি; আবার এ একই কারণে তিনি অবাঙালি, রাজপুত, মারাঠীদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও চরিত্র নিয়ে আবেগপূর্ণ কবিতা-গল্প লিখতে অনুপ্রেরণা ও আত্যন্তিক তাগিদ অনুভব করেছেন। স্বধর্মবোধ ও গভীর স্বাজাত্য-প্রীতিই তাঁকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে প্রবলভাবে ঐতিহ্যানুসারী। স্বীয় ঐতিহ্য-তরুর সংলগ্নতায় তিনি অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন। এ ঐতিহ্যানুসারিতার কারণেই প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধ ইতিহাস, পুরাকাহিনী ও জীবনবেদ বার বার তাঁর সাহিত্যে আলোক-দ্যুতি বিস্তার করেছে। এ ঐতিহ্য-চেতনা প্রত্যেক শিল্পীর একান্ত নিজস্ব। এ চেতনার বিকাশ যখন ইতিবাচকভাবে প্রকাশিত হয় তখন তাতে আপত্তির কিছুই থাকে না। তবে স্বধর্ম স্বাজাত্য-প্রীতির কারণে যখন কেউ অন্য কারো ধর্ম বা জাত্যাভিমানে আঘাত করে তখন সেটাকে বলা হয় সাম্প্রদায়িকতা আর এটা অবশ্যই আপত্তিকর। বঙ্কিম এই আপত্তিকর কাজটাই করেছেন। তাই বঙ্কিম বড় মাপের সাহিত্যিক হওয়া সত্ত্বেও সর্বজন-প্রিয় হতে পারেননি এবং তাঁর সাহিত্য উন্নতমানের হলেও মহৎ সাহিত্য বলতে যা বুঝায়, তাঁর সাহিত্য সে পর্যায়ভুক্ত নয়। সাম্প্রদায়িকতার অন্ধ বিষ-বাষ্প ও বিদ্বেষে পূর্ণ সাহিত্যে কোন মহত্ত্ব ও চিরন্তনত্ব আশা করা যায় না। তাই বঙ্কিমের সাহিত্যের আবেদন শাশ্বত ও সর্বজনগ্রাহী হতে পারেনি।

সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্য সে দোষে দুষ্ট না হলেও তাঁর কিছু কিছু রচনার মধ্যে উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলিম-বিদ্বেষ সুস্পষ্ট। এটা তাঁর বিশাল সাহিত্যের শিরে একটি কলংক-তিলক। তিলক যত ক্ষুদ্রই হোক, পূর্ণ মুখমণ্ডলে তা সহজেই স্পষ্ট ও পরিদৃশ্যমান হয়ে ওঠে। অনেকে এটা আড়াল করার চেষ্টা করেন, রবীন্দ্র-সাহিত্য-

www.pathagar.com

বিচারে তা বিবেচনাযোগ্য মনে করেন না। তাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভক্তি-ভাবের প্রকাশ ঘটলেও রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তাতে পরিস্ফুট হয় না। এ ধরনের সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলিম-বিদ্বেষ, তা বিশাল রবীন্দ্র-সাহিত্যের যত ক্ষুদ্রাংশই হোক না কেন, এটা রবীন্দ্র-মানসিকতা ও মনোভঙ্গীর এক সুস্পষ্ট উৎকট প্রকাশ তাতে সন্দেহ নেই। এবং এতে তাঁর সাহিত্যের আবেদন ও উদার রসবোধ কিছুটা ক্ষুণ্ন হয়েছে।

তবে হিন্দু-জাতীয়তাবাদী রবীন্দ্রনাথেরই এতে যথার্থ প্রকাশ ঘটেছে। মুসলমানের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা নিন্দার্হ হলেও হিন্দু জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এটা যথার্থই বলা যায়। এজন্য হিন্দু-সমাজের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট প্রশংসাও অর্জন করেছেন। অতএব, তাঁর সাহিত্য-বিচারে এ দিকটা উপেক্ষা করা তাঁকে খন্ডিত করারই নামান্তর।

রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের জন্য কিছু লেখেননি, আমার বিবেচনায় সে অভিযোগ অবান্তর। তিনি একেবারে কিছু লেখেননি তাও নয়। কিন্তু যা লিখেছেন, তাও মুসলিম-বিদ্বেষ ও মুসলমানদের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞায় পরিপূর্ণ। অতএব, এমতাবস্থায় আরো অধিক লিখলে তা মুসলমানদেরকে তৃপ্ত করতো না; বরং মুসলমানদের বিরাগ উৎপাদনেই সাহায্য করতো। তাই অধিক না লেখার ব্যাপারে আফসোস্ না করাই ভাল। এ ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ সম্ভবত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ইসলামী রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদ ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য নিয়ে লিখেছেন, মুসলিম নবজাগরণের চেতনায় সকলকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কিন্তু অন্য ধর্ম বা সম্প্রদায় সম্পর্কে কিছুই লেখেননি। এটা ভালই করেছেন। কারণ, অন্য ধর্ম বা সম্প্রদায় সম্পর্কে লিখলে হয়ত তাদের প্রতি সুবিচার করতে পারতেন না। রবীন্দ্রনাথও মুসলমানদের সম্পর্কে যদি কিছু না লিখতেন, তাহলে সম্ভবত সেটাই তাঁর জন্য ভাল হতো। কবি-শিল্পীরা তাঁদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও জীবন-পরিমণ্ডল থেকে অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেন। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, ফররুখ কেউই এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নন; নিজ নিজ ঐতিহ্য-তরুর সাথে তাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। তবে প্রকাশের ক্ষেত্রে স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্যে তাঁরা মহিমোজ্জল।

তবে এক্ষেত্রে নজরুলকে একমাত্র ব্যতিক্রম বলা যায়। তিনি মুসলিম নবজাগরণের কবি হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের সম্পর্কেই লিখেছেন। কিন্তু কারো বিরুদ্ধেই কোন বিদ্বেষ ভাব ফুটে ওঠেনি তাঁর লেখায়। তিনি ছিলেন সত্যিকারের অসাম্প্রদায়িক, উদারমনা মহৎ শিল্পী। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ নজরুলের নিকট অনেকটা নিষ্প্রভ। অবশ্য এছাড়াও, স্বাধীনতা, অবহেলিত-নিগৃহীত মানবতার সপক্ষের কবি হিসাবেও নজরুলের আরো অনেক উজ্জ্বল দিক রয়েছে, রবীন্দ্রনাথ যেখানে নজরুলের কাছে একান্তভাবেই ম্লান ও দীপ্তিহীন। গানের ক্ষেত্রেও একই কথা। ভাব-বিষয়-আবেদন, সুর-তাল-লয় ও রাগ-রাগিনী-ব্যঞ্জনায় নজরুলের গানের বৈচিত্র্য

www.pathagar.com

অপরিসীম। তাই এক্ষেত্রে নজরুলের জনপ্রিয়তা ছিল আকাশচুম্বী। রবি-রশ্মি সেখানে নজরুল-দীপ্তির কাছে অনেকটা ম্লান হয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্র-সমকালেই এক্ষেত্রে নজরুলের জনপ্রিয়তা রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে গিয়েছিল এটা একটি তাৎপর্যপূর্ণ আশ্চর্য ঘটনা, সমকালীন বোদ্ধারা তা অকপটে স্বীকার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথকে অনেকে অভিজাত শ্রেণীর কবি বলে মনে করেন। তিনি জমিদার এবং সমাজের বিত্তবান ও অভিজাত শ্রেণীর লোক ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তাছাড়া, দেশ-বিদেশের নানা অভিজ্ঞতা এবং সমাজের উঁচুস্তরের লোকদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কারণে তাঁর জীবনায়নেও আভিজাত্যের ছাপ ছিল স্পষ্ট। কলকাতায় তাঁর পৈত্রিক নিবাসও ছিল এমন যে, সেখানে সাধারণ লোকদের সচরাচর প্রবেশাধিকার ছিল না। জমিদারী কার্যোপলক্ষে প্রজাদের সাথে যেটুকু দেখা-সাক্ষাৎ হতো সেটাও ছিল অনেকটা গবাক্ষের ছিদ্রপথে আকাশ দর্শনের মত। সাধারণ মানুষের জীবন-বৈচিত্র্য ও জীবন-জটিলতার সাথে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় হবার তেমন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তাঁর সংবেদনশীল কবি-চিত্ত মানুষের মনোজগতকে খুব সহজেই উপলব্ধি করতে পারতো। তাই তাঁর সাহিত্যে বাস্তবতার প্রতিফলন যতটা নয়, মানুষের মনোজগতের বিচিত্র রহস্যময়, আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখময় জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে অন্তরঙ্গ আবেগে। জীবনের বিচিত্র অঙ্গনে, মাঝি, জেলে, জলকেলিরত নরনারী, কর্মকোলাহলপূর্ণ জনারণ্যে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষের জীবন-চাঞ্চল্য অবলোকন করেছেন, তাদের সাথে কবির কোন অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল না, কিন্তু মনোজগতে এবং বহিঃবিশ্বের মুক্ত অঙ্গনে প্রাসাদের গবাক্ষ পথে অথবা নদীবক্ষে ভাসমান বজরা থেকে কবির সাথে তাদের নিত্য যোগাযোগ হতো, কবি-কল্পনার অতীন্দ্রীয় জগতে এভাবে তারা কবির সাথে এক ধরণের গভীর আত্মীয়তার সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল। প্রকৃতির শিশু হিসাবে তাদের জীবন বৈচিত্র্যকে, মনোজগতের রহস্যময় দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভ, মান-অভিমান, প্রেম-বিরহের চিত্রকে কুশলী শিল্পীর অন্তরঙ্গতা ও আবেগ দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কবিতা-গান-গল্প-নাটক-উপন্যাসে।

রবীন্দ্রনাথ যে সময় জন্মগ্রহণ করেন, সে সময় ইতিহাসের একটা বিশেষ যুগ-সন্ধিক্ষণ। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী মানুষের সশস্ত্র সংগ্রাম–যার এক রকম সমাপ্তি ঘটে ১৮৫৭ সনের সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে। এরপর নিয়মতান্ত্রিকভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন চলতে থাকে। উনবিংশ শতকের শুরু থেকে হিন্দুর পুনরুজ্জীবন প্রয়াস এ সময় আরো বেগবান হয়। এ সময় থেকেই বাঙালি মুসলমানদের মধ্যেও নবজাগরণের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। মুসলমানরা তাদের ধর্ম, ঐতিহ্য ও গৌরবময় ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাবার তাগিদ অনুভব করে। এটা কিছুটা নিজের গরজে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হিন্দুদের চরম বিদ্বেষ, অবহেলা ও শোষণ-নির্যাতনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে। অন্য যে কোন দেশের ইতিহাস থেকে বাংলাদেশের ইতিহাস ছিল বহুলাংশে স্বতন্ত্র। বাংলাদেশে তখন ইংরেজ রাজত্ব চলছে। বাঙালি হিন্দু-সমাজ

www.pathagar.com

ইংরেজের আনুকূল্য পেয়ে শিক্ষা, বিচার বিভাগ, প্রশাসন, সেনাবাহিনী, জমিদারী, ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে শনৈ শনৈ তরক্কী করে চলেছে। তাই হিন্দু নবজাগরণ ঘটে সম্পূর্ণত ইংরেজ আধিপত্যের ছত্রছায়ায়। ফলে হিন্দু সমাজপতি, লেখক, বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক কেউই ইংরেজদের বিরুদ্ধে ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের পরিবার পুরুষানুক্রমে ইংরেজদের আনুকূল্য পেয়ে এসেছে। তাই ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব তাঁর মধ্যে আশা করা অবান্তর। মূলত ইংরেজদের সাথে সুসম্পর্ক, পুরুষানুক্রমে ইংরেজদের নিকট থেকে প্রাপ্ত বিবিধ সুযোগ-সুবিধা এবং ইংরেজী শিক্ষা-সভ্যতা, সাহিত্য-সংস্কৃতির স্নিগ্ধ সরোবরে অবগাহিত জমিদার কবি রবীন্দ্রনাথের মনে ইংরেজদের প্রতি কোন ক্ষোভ-অনুযোগের সৃষ্টি হওয়া মোটেই স্বাভাবিক ছিল না। অধিকাংশ হিন্দু জমিদার-জোতদার, বিত্তবান, অভিজাত শ্রেণীর অবস্থা তখন রবীন্দ্রনাথেরই অনুরূপ ছিল।

অন্যদিকে, মুসলমানদের অধঃপতনের মূলে ছিল পরাধীনতা। একদিকে শাসক ইংরেজদের বৈমাত্রীয় মনোভাব, অন্যদিকে হিন্দুদের বিদ্বেষ-পরায়ণতার কারণে তাদের দুরবস্থা অসহনীয় পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। এমতাবস্থায়ও উনবিংশ শতকের শেষার্ধে বাঙালি মুসলমানের মধ্যে যখন নবজাগরণের প্রেরণা সৃষ্টি হয়, তখনো তাদেরকে ঐ দ্বিমুখী প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই অগ্রসর হতে হয়। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এ হিন্দু নবজাগরণের সর্বশ্রেষ্ঠ মানস-সন্তান। তাই হিন্দু নবজাগরণের স্বপ্ন-কল্পনা, আশা-অভীপ্সা তাঁর লেখায় নানাভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাই বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমানদের নবজাগরণের প্রেক্ষাপট, উপায়-উপকরণ ও লক্ষ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। অতএব, রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব পরিমন্ডল থেকে বেরিয়ে এসে মুসলমানদের জন্য কিছু লিখবেন, এ প্রত্যাশা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। বরং নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেখাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, প্রয়োজনে যা করতে তিনি কখনো কসুর করেননি। মোটকথা, উনবিংশ শতকে শুধু বাঙালি হিন্দু নয়, সমগ্র উপমহাদেশীয় হিন্দু-সমাজের রেনেসাঁসের পটভূমিতে রবীন্দ্র-মানস পরিগঠিত এবং সে রেনেসাঁসের পরিচর্যা ও সফল পরিণতি লাভের আত্যন্তিক প্রয়াসেই সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্য নিবেদিত।

বিংশ শতাব্দীতে, রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে, পৃথিবীতে দু'-দু'টি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র কায়েম হয়েছে, পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতাকামী মানুষের সংগ্রাম তীব্র হয়ে উঠেছে, উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনও তখন একটা বিশেষ ক্রান্তি-লগ্নে উপনীত হয়েছে। বাংলার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তখন একের পর এক তাঁর অনলবর্ষী কাব্য-কবিতা, গান ও লেখায় পরাধীনতার শৃংখল মুক্ত হবার আহবান জানিয়ে জেল-জুলুম ভোগ করছেন, নিগ্রহের শিকার হচ্ছেন। কিন্তু বিস্ময়কর হলেও সত্য, বাংলা ভাষার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের লেখায় তখন এ সবের কোন

www.pathagar.com

প্রতিফলন নেই। তিনি রাজনৈতিক-সামাজিক ব্যাপারে অসচেতন ছিলেন তা নয়, হিন্দু জাতীয়তাবাদী স্বার্থ যাতে ক্ষুণ্ন না হয়, সে জন্যই সম্ভবত তিনি সুচিন্তিতভাবে স্বরাজ আন্দোলন, অসহযোগিতা আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন ইত্যাদি সম্পর্কে নীরব থাকা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিরোধিতা করাই সঙ্গত মনে করেছেন। কারণ ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, শাসক ইংরেজদের প্রতি সহযোগিতামূলক মনোভাব পোষণ করেই হিন্দু-সমাজ উন্নতির সোপান বেয়ে তর্‌তর্‌ করে উপরে উঠে এসেছে, এমনকি, এক কালের শাসক মুসলমানদেরকে সর্বক্ষেত্রে বঞ্চিত করে হিন্দুরা সর্বক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করেছে। প্রাজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ তাই এক্ষেত্রে নীরবতা অবলম্বন করাই যথার্থ মনে করেছেন অথবা ক্ষেত্রবিশেষে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করাই সঙ্গত মনে করেছেন। এসব কিছুই তিনি করেছেন তাঁর স্বজাতির স্বার্থে এবং ইংরেজ-তোষণ-নীতির পারিবারিক সনাতন ঐতিহ্য থেকে।

রবীন্দ্রনাথের পরিবার ঐতিহ্যগতভাবে শাসককুলের প্রতি সর্বদা আনুগত্যশীল ছিল। মুসলিম শাসনামলে তাঁর পূর্ব-পুরুষগণ যেমন মুসলিম শাসকদের অনুগত থেকে তাদের নিকট থেকে বিবিধ সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছে, ইংরেজ আমলেও তেমনি তাদের তোষামোদ করে তাঁর পরিবার উন্নতির সোপান বেয়ে এগিয়ে গেছে। তাই রাজদ্রোহ নয়, রাজানুগত্য রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ পারিবারিক ঐতিহ্য।

ইউরোপীয় সাহিত্যে যখন ধীরে ধীরে রোমান্টিক ভাবালুতার পরিবর্তে বস্তুনিষ্ঠতা ও জীবন-বাস্তবতার প্রকাশ ঘটছে– রবীন্দ্রনাথ তখনো উনবিংশ শতকীয় রোমান্টিক চেতনায় একান্তভাবে আচ্ছন্ন। এ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের ভগবৎপ্রেমমূলক ভাবাতিশয্যপূর্ণ কাব্য যে কিছু সংখ্যক ইউরোপীয় কবির সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, এমনকি, তিনি এ সময় তাঁর 'গীতাঞ্জলী' কাব্যের ইংরেজী অনুবাদের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন, তার কারণ অন্যত্র নিহিত বলে অনেকের ধারণা। নোবেল পুরস্কার লাভের অল্পকাল পূর্বে পরাধীন ভারতে ইংরেজ-বিরোধী 'স্বরাজ আন্দোলন' বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। রবীন্দ্রনাথ এ স্বরাজ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। এর পুরস্কার স্বরূপই কি তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছিল? এ প্রশ্ন অনেকেই করে থাকেন। তাছাড়া, ১৯১১ সনে বঙ্গভঙ্গ রদের প্রাক্কালে ইংল্যান্ডের রাজার দিল্লী আগমন উপলক্ষে রাজাকে যে বিশাল জাঁকজমকপূর্ণ সংবর্ধনা দেয়া হয় তাতে রবীন্দ্রনাথ রচিত 'জনগণ মন অধিনায়ক হে, ভারত ভাগ্য-বিধাতা' গানটি উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসাবে গাওয়া হয়। ইংরেজ রাজশক্তি এতে বিশেষভাবে প্রীত ও মুগ্ধ হয়ে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেন বলেও অনেকের ধারণা। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধু উপযুক্ততাই এ পুরস্কার লাভের একমাত্র মাপকাঠি নয়, এ জন্য রাজনৈতিক ও অন্যান্য কার্যকারণ ও বিবেচনাও কাজ করে থাকে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ঐসব বিষয় বিবেচিত হয়েছে কিনা সেটাই অনেকের প্রশ্ন। যাক, এ

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ না করাই বাঞ্ছনীয়। তবে অন্য একটি বিষয় এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা সঙ্গত বলেই মনে হবে।

ফরাসী লেখক রুশো-ভলতেয়ারের সাহিত্য ফরাসী বিপ্লবের উদ্গাতা হিসাবে চিহ্নিত । তাঁদের রচিত গ্রন্থাদি শতাধিক কাল ফ্রান্সসহ পৃথিবীর বহু দেশে মুক্তিকামী মানুষের অনুপ্রেরণা তথা জাতীয় আশা-আকাংক্ষার প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হয়। কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্য কোন মুক্তিকামী, স্বাধীনতাকামী মানুষের মনে কোন রূপ অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে না, কোন জাতির মধ্যে জাগরণের আশা-আকাঙ্ক্ষা-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে না; রবীন্দ্র-কাব্য কেবল একঘেয়ে রোমান্টিক ভাবালুতা সৃষ্টি করে—যা তাঁর সমকালেই অনেকের নিকট নিদারুণ ক্লান্তিকর বলে মনে হয়েছে। তাই তাঁর সমকালেই নজরুলের আবির্ভাব অনিবার্য হয়ে পড়েছিল এবং জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে তিনি তখন রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। পরাধীন ভারতের মুক্তিকামী অবহেলিত, নির্যাতীত, নিষ্পেষিত জনগণ নজরুলের মধ্যেই তাদের জীবনের স্পন্দন ও জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন লক্ষ্য করেছিল। 'কল্লোল যুগ' ও 'তিরিশে'র কবিদের আবির্ভাবের কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রধানত রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করে, রবীন্দ্র-প্রভাব বলয় থেকে বেরিয়ে এসে ভিন্ন স্বাদের কবিতা রচনার আকুতিই তাঁদেরকে স্বতন্ত্র ধারার কাব্য-সাধনায় অনুপ্রাণিত করে।

অবশেষে রবীন্দ্র-কাব্যে প্রেম ও সৌন্দর্যবোধ সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোকপাত করার প্রয়াস পাব। রবীন্দ্র-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ ও সর্বজনীন সার্থক প্রকাশ ঘটেছে এক্ষেত্রে। প্রেম ও সৌন্দর্যের আবেদন তাঁর নিকট ছিল অসাধারণ। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অনন্ত সৌন্দর্য ও প্রেমের অনুসন্ধান করেছেন। সাকার মানুষের দৈহিক সৌন্দর্য ও কামনা-বাসনার মধ্যে তাঁর প্রেম ও সৌন্দর্যানুভূতির প্রথম প্রকাশ। কিন্তু রোমান্টিক কবিরা সীমার মধ্যে অসীমের সন্ধান করেন। তাই রবীন্দ্রনাথ নারীর দেহগত সৌন্দর্যের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করে তিনি মানুষের অন্তহীন অন্তর্জগতের সীমাহীন সৌন্দর্য অনুসন্ধান করেছেন, প্রেমের গভীরতা উপলব্ধি করেছেন এবং এক পর্যায়ে তাঁর মানবিক প্রেম ভগবৎ প্রেম বা আধ্যাত্মিক প্রেমে পর্যবসিত হয়েছে। মানুষের অন্তর্জগতের অজস্র খণ্ড-ক্ষুদ্র ঘটনা-সংঘাত, ক্রিয়া-বিক্রিয়া, ভাব, অনুভূতি, প্রেম-বিরহ ইত্যাদির এক শিল্প-সুন্দর মহিমান্বিত রূপ ফুটে উঠেছে তাঁর কাব্যে।

বিশ্ব-জগত ও মানব-মনের এ চিরন্তন প্রেম ও সৌন্দর্যের দিকটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে ও গানে যে অপরূপ সৌন্দর্য—মহিমায় বিচিত্র ভাব ও অনুভবে ফুটিয়ে তুলেছেন শুধু বাংলা সাহিত্যেই নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও তার তুলনা অতিশয় বিরল। এক্ষেত্রে তিনি কালিদাস, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, শেলী, কীট্‌স, ওমর খৈয়ামের সমকক্ষ বা এঁদের কারো কারো চেয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে অধিকতর বড়—সর্বকালের অত্যতম শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা।

www.pathagar.com

সাহিত্যে প্রতিফলিত প্রেম ও সৌন্দর্যানুভূতি প্রত্যেক কবি বা সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত অনুভূতি, অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসের অভিব্যক্তি। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথেরও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ ঘটেছে অনিবার্যভাবেই। তবে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ছাপ থাকা সত্ত্বেও প্রেম ও সৌন্দর্যবোধের একটি কাল-নিরপেক্ষ শাশ্বত দিক রয়েছে, সে কারণে রবীন্দ্র-কাব্যের এ দিকটির আবেদন বিশ্বজনীন ও চিরন্তন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

রবীন্দ্রনাথ যেহেতু বিশ্বমানের কবি তাই, রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের পরিমিতিবোধ বিশেষ প্রয়োজন। অনেকে বলে থাকেন, এমন কিছু নেই যা রবীন্দ্র-সাহিত্যে নেই। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশালত্ব বুঝাতে অনেকে এরূপ বলে থাকেন। এধরনের কথায় অবশ্যই অতিশয়োক্তি রয়েছে। অতিশয়োক্তির দ্বারা ভাবাবেগ ও ভালবাসার প্রকাশ ঘটলেও সাহিত্য বিচারে তার কোন মূল্য নেই। তাই রবীন্দ্র সাহিত্যালোচনায় রবীন্দ্র-ভক্তির যেমন দাম নেই; রবীন্দ্র-বিদ্বেষও তেমনি অনাকাংক্ষিত। সম্পূর্ণ নিস্পৃহ দৃষ্টিতে সাহিত্যানুরাগী মন নিয়েই রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠে মনোযোগী হতে হবে, তাহলেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের যথার্থ রসাস্বাদন সম্ভব। সবশেষে কবি গোলাম মোস্তফার 'ইকবাল ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে একটি উদ্ধৃতি পেশ করে আলোচনা শেষ করতে চাই। তিনি লিখেছেন ঃ

"প্লেটোর মায়াবাদ, বুদ্ধের নির্বাণবাদ, শঙ্করের অদ্বৈতবাদ, ইবনে আরাবীর সুফীবাদ, আদিম যুগের প্রতীকবাদ–সকলেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায় রবীন্দ্র-কাব্যের মধ্যে। বলিষ্ঠ আত্মপ্রতিষ্ঠার বাণী, গতির বাণী, মানবাত্মার অপরিসীম শক্তি ও সম্ভাবনার বাণী, মানুষের গৌরবোজ্জ্বল পরজীবনের বাণী, সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে তার শ্রেষ্ঠত্বের বাণী, তার সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার বাণী রবীন্দ্র-কাব্যে বিরল। মান-অভিমান, বিনয়, বৈষ্ণবসুলভ প্রেম-নিবেদন এবং বিশ্বপ্রকৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে তাঁর মানসসুন্দরীর অনুভব ও লীলা-দর্শন–এই সবই রবীন্দ্রকাব্যের বৈশিষ্ট্য। তাঁর 'গীতাঞ্জলী', 'নৈবেদ্য,' 'সোনার তরী' 'পূরবী' এবং সমস্ত ধর্মসঙ্গীতের মধ্যে মাত্র একটি বিশেষ সুরই ধ্বনিত হয়েছে, সেটি হল আত্ম-বিসর্জনের সুর;–'খসে যাবার ঝরে যাবার সুর'। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ গতির কবি নন—বিরতির কবি।"

রবীন্দ্র-কাব্যালোচনায় গোলাম মোস্তফার উপরোক্ত মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। রবীন্দ্র-সাহিত্য যেমন বিশাল, সে তুলনায় বৈচিত্র্য কম, জীবন-বাস্তবতা, সর্বশ্রেণীর মানুষের আবেগ-অনুভূতি, ব্যক্তিগত বা জাতীয় আশা-অভীপ্সার কথা রবীন্দ্র-সাহিত্যে দুর্নিরিক্ষ। তবু স্বীকার করতে হবে, রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথই—তাঁর সমকক্ষ বাংলা সাহিত্যে আর কে-ই বা আছেন, বিশ্ব-সাহিত্যেও তো হাতে গোণা মাত্র ক'জন।

www.pathagar.com

রবীন্দ্র-মানস ও আমরা

বাংলা সাহিত্য তথা বিশ্ব সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। যদিও কবি হিসাবেই তাঁর সমধিক খ্যাতি, কিন্তু কবিতা ছাড়াও সাহিত্যের অন্যান্য সকল শাখা, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী, আত্মজীবনী, গীতিনাট্য, চিত্রনাট্য, শিশুসাহিত্য, রম্য রচনা, পত্র সাহিত্য, অনুবাদ এমনকি, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, চিত্রকলা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ অবদান তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। এরূপ বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় শুধু বাংলা সাহিত্যে কেন, বিশ্ব-সাহিত্যেও নিতান্ত দুর্লভ।

রবীন্দ্রনাথ প্রধানত গীতিকবি। বাংলাদেশের মাটি, প্রকৃতি ও আবহাওয়ার সাথে গীতিধারার এক স্বাভাবিক সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায়। তাই আদি কাল থেকেই এদেশের সকল কবির মধ্যেই গীতিপ্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। চর্যাপদের কবি কানুপা, কাহ্নপা বা কাহ্নপা, সরহ, শবর, জালন্ধরী বা হাড়িপা প্রমুখ, সেন আমলের রাজকবি জয়দেব (যদিও সংস্কৃত ভাষার কবি), মুসলিম আমলের মালাধর বসু, কৃত্তিবাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানীদাস, গোবিন্দদাস, মোহাম্মদ সগীর, সৈয়দ সুলতান, দৌলত কাজী, আলাওল, ভারতচন্দ্র, ইংরেজ আমলের মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, কায়কোবাদ, বিহারী লাল, লালন ফকীর প্রমুখ সকলেই ছিলেন মূলত গীতিকবি। রবীন্দ্রনাথ এ গীতি-ঐতিহ্যের একজন শ্রেষ্ঠ রূপকার। কৈশোরে তিনি বিদ্যাপতির আদলে 'ভানুসিংহের পদাবলী' রচনা করেন, পরিণত বয়সে ইরানের সুফী কবি হাফিজ, খৈয়াম ও বাংলার মরমী কবি লালন ফকীরের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে 'গীতাঞ্জলী' ও এ ধারার বিভিন্ন কাব্য রচনা করেন।

গীতিকবিরা সাধারণত রোমান্টিক। প্রেম, প্রকৃতি ও মানুষ, বিশেষত মানুষের অন্তর জগতের অনির্বচনীয় ক্রিয়া-বিক্রিয়া, ভাব-কল্পনাই তাঁদের কাব্যের বিষয়। প্রেমের বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে, প্রকৃতি প্রেম, নর-নারীর প্রেম, সাধারণ মানব প্রেম, অধ্যাত্ম প্রেম ইত্যাদি প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ গীতি কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্য চিরকাল কবিদের আকৃষ্ট করে থাকে। গীতিকবিরা প্রকৃতির চিরায়ত রূপের মধ্যে নিজেদের অন্তঃর্লোকের অনিবর্চনীয় সৌন্দর্য অবলোকনের প্রয়াস পান। পৃথিবীর সকল কবির কবিতার প্রধানতম বিষয় হলো মানুষ। মানুষের দুটি দিক। একটি তার বহিরঙ্গ দিক আরেকটি তার অন্তর্লোক। গীতিকবিরা সাধারণত মানুষের অন্তর্লোকের

www.pathagar.com

কথাই বেশী বলেন। গীতিকবিরা সাধারণত ভাবনার চেয়ে ভাবকে, চিন্তার চেয়ে কল্পনাকে, বস্তুর চেয়ে অবস্তুকে, কায়ার চেয়ে ছায়াকে অধিক প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এ সকল অর্থেই রবীন্দ্রনাথ এক অসাধারণ গীতিকবি। তাঁর কবিতায় বিচিত্র বিষয়, ভাব ও কল্পনা স্থান লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের গীতিপ্রবণতার সাথে মরমীভাবের সুসমন্বয় ঘটেছে। মাত্র তের বছর বয়সে তিনি যখন বিদ্যাপতির বৈষ্ণব পদাবলীর আদলে 'ভানুসিংহের পদাবলী' রচনা করেন তখনই তাঁর মধ্যে মরমী ভাবের প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। পরিণত বয়সে তাঁর উপর বিখ্যাত বাউল কবি লালন ফকীরের বিশেষ প্রভাবের কথা সর্বজনবিদিত। তবে পারস্যের মরমী কবিদের দ্বারাই তিনি সম্ভবত সর্বাধিক প্রভাবিত হয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, লালন ফকীরও পারস্যের মরমী কবিদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) ফারসী ভাষা-সাহিত্য, বিশেষত পারস্যের সুফী কবিদের বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। নিজের পুত্রদেরকেও তিনি ফারসী পড়াবার জন্য মুনশী নিযুক্ত করেছিলেন। সে মুনশী একাধারে ফারসী ভাষা ও গযল শিখাতেন ও লাঠিখেলারও তালিম দিতেন। এভাবে ছোটবেলাতেই পারিবারিক পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ ফারসী ভাষা ও ইরানের সুফী কবিদের রচনার সাথে বিশেষ পরিচিত হয়ে ওঠেন।

পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগবশত দেবেন্দ্রনাথের সুফী সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ নিজেই মানুষের ধর্ম সম্পর্কে তাঁর হিবার্ট বক্তৃতায় বলেছিলেন ঃ "বাউলের কাছেই তিনি মানুষের ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। বাউলরা সকলেই মরমী সাধু রুমী, হাফিজ, জামী প্রভৃতির শিষ্য।"

রবীন্দ্রনাথের এ উক্তি যথার্থ। বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার যতটা সরাসরি আরব ধর্ম-প্রচারক, আউলিয়া, দরবেশ, বণিকদের দ্বারা হয়েছে,তার চেয়ে অনেক বেশী প্রচার হয়েছে ইরানী ধর্ম-প্রচারক ও ইরানী সুফীদের দ্বারা। ফলে ইরানের সুফীভাব ও দর্শনের সাথে এদেশের মুসলমানদের পরিচয় ঘটেছে বহুকাল পূর্বেই। ইরানীদের মেজাজ ও চিন্তা-দর্শনের সাথে বাঙালি-স্বভাবের একটা মিলও লক্ষ্য করা যায়। তাই ইরানী সুফীবাদ সহজেই বাঙালির চিন্তা-চেতনাকে আকৃষ্ট করে।

এছাড়া, বহুকাল পর্যন্ত ফারসী আমাদের রাজভাষা থাকার কারণে জনগণের মধ্যে ফারসীর ব্যাপক প্রচলন ছিল। মুসলিম রাজত্বের অবসান ঘটলেও ইংরেজ শাসনামলে ফারসীর বদলে ইংরেজী রাজভাষা হওয়া সত্ত্বেও ফারসী দীর্ঘকাল পর্যন্ত আমাদের শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষিত মহলে একটি জনপ্রিয় ভাষা হিসাবে বহাল ছিল। ফারসীর সুবাদে ইরানের সুফী কবিরাও বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন। মূলত এই সেদিন পর্যন্ত সুফী কবিদের থেকে উদ্ধৃতি ব্যতিরেকে কোন লেখা বা বক্তৃতাই সুখপাঠ্য বা

www.pathagar.com

শ্রুতিমধুর রূপে বিবেচিত হতো না। গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন মাহফিল ও জলসায় আলেম-ওলামাগণ অনর্গল ফারসী বয়েত আবৃত্তি করে তাদের ওয়াজকে সাধারণ শ্রোতার নিকট আকর্ষণীয় করে তুলতেন। এখনো পর্যন্ত অনেক প্রবীণ শিক্ষিত ব্যক্তি অনর্গল ফারসী বয়াত আবৃত্তি করতে পারেন। এ কারণে ইরানী সুফী কবিদের দ্বারা বাংলা বাউল ও মরমী সাধকগণই যে শুধু প্রভাবিত হয়েছিলেন তাই নয়, সাধারণ মানুষও অনেকখানি প্রভাবিত হয়। শুধু তাই নয়, হিন্দু সমাজেও এর প্রভাব বহুক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। হিন্দু ধর্মীয় নেতা শ্রীচৈতন্য ইরানী সুফীবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাভিত্তিক বৈষ্ণব ধর্মমত চালু করেছিলেন এবং তারই ফলে এককালে এদেশে বৈষ্ণব সাহিত্যের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথের উপরও ইরানী সূফী কবিদের প্রভাব ছিল গভীর।

সুফী দর্শনের সাথে বেদান্তেরও কিছু মিল আছে। রবীন্দ্রনাথ বেদান্ত অধ্যয়ন করেছিলেন এবং এর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথও বেদান্ত অধ্যয়ন করেছিলেন। কিন্তু তিনি এর দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হননি। তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের চিন্তা-দর্শন ও ইরানী সুফীবাদের দ্বারা। রামমোহন (১৭৭৪-১৮৩৩) ছিলেন একেশ্বরবাদী। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি বেদান্তের চেয়ে আল কুরআনের দ্বারাই অধিক প্রভাবিত ছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম মূলত ইসলাম, হিন্দুধর্ম ও খৃস্টধর্মের একটি সমন্বয় হলেও এর মূল ভিত্তি একেশ্বরবাদের ধারণা আল-কুরআন থেকেই নেয়া। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহন-প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের অনুসারী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও পিতা দেবেন্দ্রনাথের পদাংক অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে ব্রাহ্মধর্মের অনুসারীদের সংখ্যা নগণ্য হয়ে পড়ায় এবং তারা পরস্পর দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ায় সমাজে ব্রাহ্মধর্ম ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথও ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেন। মূলত বেদান্ত এবং অংশত সুফীবাদ ও মরমীবাদের প্রতিই তাঁর আকর্ষণ শেষ পর্যন্ত প্রবল এবং অটুট ছিল।

রবীন্দ্রনাথ রামমোহন ও পিতা দেবেন্দ্রনাথের আদর্শে গড়ে উঠলেও তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন বলে মনে হয় না। বরং বেদান্তের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ দিন দিন প্রবল থেকে প্রবলতর হয়। তিনি প্রাচীন হিন্দু-ভারত, বৈদিক আদর্শ, সংস্কৃতি ও চিন্তা-দর্শনের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেন ও তার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তাঁর বিভিন্ন লেখায় এর প্রতিফলন ঘটেছে। হিন্দু জাতীয়তাবাদের উন্মেষ-লগ্নে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। ফলে রবীন্দ্র-মানসে তার একটা প্রভাব ছিল খুবই স্বাভাবিক। এ প্রভাবের ফলেই তিনি ক্রমান্বয়ে হিন্দু পুরাণ ও বৈদিক আদর্শের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতী আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন আর্য হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতি, ধর্ম ও দর্শনের পুনরুত্থান।

www.pathagar.com

এর মাধ্যমে হিন্দু পুনর্জাগরণের নামে সংকীর্ণ হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও উগ্র সাম্প্রদায়িক মতবাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এ সময় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) মুসলিম বিদ্বেষপূর্ণ সাম্প্রদায়িক সাহিত্য এতে ঘৃতাহুতির কাজ করে। ১৮৮৫ সনে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় হিন্দু কংগ্রেস হিন্দু পুনর্জাগরণের আবেগ ও স্বপ্নকে লালন ও একটা সংহত সাংগঠনিক রূপ দান করে। ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এ সময় হিন্দুরা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গেমাতরম'কে তাদের জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত করে। প্রধানতঃ বঙ্গভঙ্গ রদ করার উদ্দেশ্যেই হিন্দুরা এ সময় বিভিন্ন সন্ত্রাসমূলক সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলে।

গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস ভারতব্যাপী স্বদেশী আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯০৫ সনের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ার দিন ভারতীয় কংগ্রেস দেশব্যাপী 'শোক দিবস' পালন করে। ঐ দিন হিন্দুরা উপবাসব্রত পালন করে আত্মশুদ্ধির জন্য নগ্নপদে গঙ্গাস্নানে যায় এবং হিন্দু ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রতীক 'রাখীবন্ধন' অর্থাৎ হাতে লালফিতা ধারণ করে। এছাড়া, মহারাষ্ট্রের উগ্র সাম্প্রদায়িক নেতা বালগঙ্গাধর তিলকের গো-রক্ষা আন্দোলন, মারাঠা দস্যু ছত্রপতি শিবাজীর স্মরণে 'গণপতি উৎসব' চালু করা হয় এবং ১৯০৫ সনে বারানসীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের জাতীয় অধিবেশনে চরমপন্থীরা কংগ্রেস নেতৃত্বকে উগ্র জাতীয়তাবাদী ও আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণে প্ররোচিত করে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই রবীন্দ্রনাথ অখণ্ড বাংলার বন্দনামূলক এবং বঙ্গভঙ্গরদ আন্দোলনকে বেগবান করার উদ্দেশ্যে তাঁর বিখ্যাত 'সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি রচনা করেন।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের দ্বারা খানিকটা আক্রান্ত হলেও, কংগ্রেসের স্বরাজ আন্দোলন, উগ্রপন্থীদের সন্ত্রাসবাদকে তিনি কখনো সমর্থন করেননি, কিন্তু হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতা বালগঙ্গাধর তিলকের 'গণপতি উৎসবে'র সমর্থক হিসাবে 'শিবাজী উৎসব', 'হোরিখেলা', 'বন্দীবীর' প্রভৃতি চরম মুসলিম-বিদ্বেষী কবিতা রচনা করেন। মুসলমানদের স্বার্থহানিকর বঙ্গভঙ্গ রদের দাবীতে কলকাতায় অনুষ্ঠিত নাগরিক সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। ১৯০৫ সনের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ার দিন কলকাতায় হিন্দুদের আয়োজিত ধর্মঘট, শোভা-যাত্রা, গঙ্গাস্নান, রাখীবন্ধন প্রভৃতি কর্মসূচীতে অন্যান্যদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পুরোভাগে এবং সেদিন তিনি বহু পথচারীর হাতে রাখী বেঁধে দিয়েছিলেন। সেদিন অপরাহ্নে 'মিলন মন্দিরে'র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে রোগাক্রান্ত চরম হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতা আনন্দমোহন বসু লিখিত ইংরেজী ভাষণ পাঠ করেন আশুতোষ চৌধুরী এবং তার বাংলা তরজমা পড়ে শোনান রবীন্দ্রনাথ। পরবর্তী কয়েক বছর পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গরদ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অন্যতম প্রধান নেতা।

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না, হিন্দু জাতীয়তাবাদের উগ্রপন্থীদের কর্মধারার প্রতিও তাঁর সমর্থন ছিল না, কিন্তু রামরাজত্ব কায়েমের স্বপ্নে বিভোর হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদীদের ভাব-কল্পনার সাথে তিনি প্রায় অভিন্ন ছিলেন। তাই জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল ভারতীয়কে তিনি 'এই মহাভারতের মহামানবের সাগর তীরে' 'একদেহে লীন' হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি 'অখন্ড ভারত-মন্ত্রে' দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীকে। তাই তিনি তাঁর প্রাণবীণার তারে সুরের তরঙ্গ তুলে গেয়েছিলেনঃ

"হেথায় আর্য হেথা অনার্য
হেথায় দ্রাবিড়, চীন
শক, হুন দল পাঠান মোঘল
এক দেহে হল লীন।"

তাঁর অনেক লেখায় তিনি মহাভারতের আদর্শ ও হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পেয়েছেন। এ জন্য মুসলমানদের হেয় প্রতিপন্ন করতেও তিনি কসুর করেননি। এ থেকে তাঁর হিন্দুত্ব ও হিন্দু জাতীয়তাবাদী মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখানে তাঁর লেখা থেকে মাত্র কয়েকটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। বাংলা ১৩৪১ সনের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত 'প্রবাসী' পত্রিকায় তিনি লেখেন ঃ

"আমি বলচি, যা কিছু মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শের সঙ্গে মেলে তাই হিন্দুধর্ম। কেননা, হিন্দুধর্মে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম তিন পন্থাকেই ঈশ্বরের সঙ্গে যোগের পন্থা বলেচেন। খৃষ্টান ধর্মের চেয়ে হিন্দুধর্মের একটা জায়গায় শ্রেষ্ঠত্ব এই দেখি, হিন্দুধর্ম সন্ন্যাসবাদের ধর্ম নয়।....হিন্দুধর্মকে বাইরের দিকে যে সব স্থূল আবরণে আবৃত করেছে, তাকে বাদ দিয়ে যে জিনিষটাকে পাই সেতো কোনো ধর্মের চেয়ে কোনো অংশে নিকৃষ্ট নয়। কেননা, এতে মানুষের হৃদয় মন, আত্মা এবং কর্মচেষ্টা সমস্তকেই ভূমার দিকে আহ্বান করেচে। আমি এই জন্যেই হিন্দু নাম ছাড়তে পারিনে–ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্ম থেকে পৃথক করতে পারিনে।"

হিন্দু-মুসলিম বিভেদের বীজ প্রথমে অঙ্কুরিত হয় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে। হিন্দুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গঠিত হয় 'হিন্দুমেলা' ও জাতীয় সভা (১৮৬৯) রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ভারত বর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা হিন্দুমেলাতেই সর্বপ্রথম লক্ষণীয়। এই মেলায় দেশের স্তবগানগীত দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্পী, ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত... এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য বৎসরের শেষে হিন্দু জাতিকে একত্রিত করা।... যত লোকের জনতা হয় ততই হিন্দুমেলাও ইহা হিন্দুদিগের জনতা এই মনে হইয়া হৃদয় আনন্দিত ও স্বদেশানুরাগ বর্ধিত হইতে থাকে। আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্মকর্মের জন্য নহে,

www.pathagar.com

কেবল আমোদ-প্রমোদের জন্য নহেথ– ইহা স্বদেশের জন্য, ভারতভূমির জন্য।" [দ্রঃ জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্ররচনাবলী-১০, পৃঃ ৬৬]

সুতরাং সহজেই অনুমেয় অনুন্নত হরিজন, নিপীড়িত নিষ্পেষিত মুসলিম ও অহিন্দু এবং হিন্দুমেলার সমর্থকদের মাঝে সাম্প্রদায়িকতার প্রাচীর তুলে দেওয়া সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ তৈরী করারই ছিল এই মেলা বা সভার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এমন আর একটি বিষবৃক্ষ ছিল 'সঞ্জীবনী সভা'। সেখানে ঋকবেদের মন্ত্র পড়ে সভ্যদের দীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ "বাংলাদেশের পূর্বভাগে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। ধর্মগত ও সমাজগত কারণে মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুর চেয়ে ঐক্য বেশি। সুতরাং শক্তির প্রধান উপকরণ তাহাদের মধ্যে নিহিত হইয়া আছে।" (রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম ও ১৪শ খণ্ড)।

এতে হিন্দুধর্মের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় আস্থার কথা ব্যক্ত হয়েছে। হিন্দুধর্মের বাহ্যিক ও সংস্কারগত দিকের মৃদু সমালোচনা করলেও সামগ্রিকভাবে হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তাঁর দ্বিধাহীন মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আদমশুমারী রিপোর্টে রবীন্দ্রনাথকে ব্রাহ্মধর্মের অন্তভুক্ত করা হলে তিনি তার তীব্র প্রতিবাদ করে বলেছিলেন যে, ব্রাহ্মধর্ম হিন্দু ধর্মেরই উন্নত সংস্করণ। অতএব তাঁকে হিন্দুধর্মের অনুসারী রূপেই গণ্য করার জন্য তিনি দাবী জানান।

ত্রিপুরার তদানীন্তন মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যর নিকট লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ "হিন্দুর যথার্থ গৌরব কি এবং হিন্দুর উন্নতি সাধনের প্রকৃত পথ কোন দিকে, 'বঙ্গদর্শনে' তাহাই সম্যক আলোচিত হইলে আমি চরিতার্থ হইব। হিন্দুত্ব কি, তাহাই আমি ক্রমশ দেখাইতেছি এবং সেই সঙ্গে একথাও জানাইতেছি যে, য়ুরোপীয় সভ্যতায় যাহাকে ন্যাশনাল মহত্ত্ব বলে, তাহাই মহত্ত্বের একমাত্র আদর্শ নহে। আমাদের বিপুল সামাজিক আদর্শ তাহা অপেক্ষা অনেক বৃহৎ ও উচ্চ ছিল।" (চিঠিপত্রঃ রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ১৩৩)।

শান্তিনিকেতনে প্রথম স্কুল প্রতিষ্ঠার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিন্তাধারা সম্পর্কে আচার্য জগদীশচন্দ্রের নিকট এক চিঠিতে লেখেন ঃ "শান্তিনিকেতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। সেখানে ঠিক প্রাচীন কালের গুরুগৃহ বাসের মত সমস্ত নিয়ম। ধনী-দরিদ্র সকলকেই কঠিন ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত হইতে হইবে।...ছেলেবেলা হইতে ব্রহ্মচর্য্য না শিখিলে আমরা প্রকৃত হিন্দু হইতে পারিব না।" (ঐ, পৃ.৩৫-৩৬)।

এ সম্পর্কে আরো তথ্য পাওয়া যায় সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের লেখায়। তিনি কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'শারদীয় দেশ' সংখ্যায় "রবীন্দ্র মানসে হিন্দু ধর্ম" শীর্ষক প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন ঃ "১৯০১ সালের ডিসেম্বরে শান্তি নিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। নাম থেকেই এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য এবং প্রতিষ্ঠাতা বা প্রতিষ্ঠাতাদের

www.pathagar.com

আদর্শ এবং এই বিদ্যালয়ের চরিত্র সহজেই আন্দাজ করে নেওয়া যায়। আদর্শ হলো প্রাচীন ভারতের তপোবন, শিক্ষকেরা গুরু, ছাত্রেরা ঋষি কুমার। তপোবন যে ঐতিহাসিক সত্য, শুধু অতীতের নয়, চিরকালের সত্য, এ আদর্শ যে মোটেই কালাতিক্রান্ত নয়, অবিলম্বে এ কালের জীর্ণ ভারতবর্ষকে উদ্ভিন্ন করে এক মহাজীবনের আবির্ভাব হবে সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। তপোবন বিদ্যালয়ের কাঠামো যে সর্বভারতীয় হওয়া সম্ভব নয়, বাস্তব পরিস্থিতিতে সম্ভব নয়, তা রবীন্দ্রনাথের মনে হয়নি, অন্তত তখন মনে হয়নি। ভারতীয়ত্ব আর হিন্দুত্বকে সেদিন তিনি অল্পবিস্তর গুলিয়ে ফেলেছিলেন। পরে অনেক পরে তপোবনের ঐতিহাসিক সত্যতার বিষয়ে তিনি নিজেই গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আপাততঃ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময়ের কথাই বলি– নিয়মাবলীতে বলা হলোঃ 'ছাত্রগণকে স্বদেশের প্রতি বিশেষরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধাবান করিতে চাই।' অনতিকাল পরে দেখা গেল এই সময় রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বদেশ আর হিন্দুধর্ম প্রায় এক হয়ে গিয়েছে।

বিদ্যালয়ের জীবন চর্চায় প্রাচীন ভারত দেখতে দেখতে হিন্দু ভারত হয়ে উঠল। হিন্দুধর্মের বর্ণাঢ্য ছটা মণ্ডলের সম্মোহনে ক্রমে রবীন্দ্রনাথ একজন অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু হয়ে উঠলেন। এবং আশ্রম বিদ্যালয়ে সংহিতার অনুশাসন, বর্ণাশ্রম-ভেদাভেদ, ব্রাহ্মণ্য গরিমা সবই ঢুকে পড়লো। রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করলেন, 'অ-ব্রাহ্মণ শিক্ষক ব্রাহ্মণ ছাত্রের প্রণম্য নয়।"

এতে প্রমাণিত হয়, রবীন্দ্রনাথ শুধু গোঁড়া হিন্দু ছিলেন তাই নয়, হিন্দুর কৌলিন্য ও জাতিভেদ প্রথার প্রতি তাঁর আস্থা ছিল প্রবল। রবীন্দ্রনাথের পিতা ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম। পিতাকে তিনি আদর্শ পুরুষ মনে করতেন। ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, এবং রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথের ধর্মগুরু রাজা রামমোহন রায়কে তিনি আরো বড় আদর্শরূপে বিবেচনা করতেন। পারিবারিকভাবে তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তাঁর আকর্ষণ শিথিল হয়ে পড়ে এবং বেদান্ত দর্শনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর নিষ্ঠাও ক্রমন্বয়ে গভীরতর হয়। উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহে তার প্রমাণ মেলে। কিন্তু রবি-ভক্তগণ এ সত্য চাপা দিতে চান। বিশিষ্ট রবীন্দ্র-গবেষক অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী বলেন ঃ

"রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ছিলেন, এই ভুল ধারণাটা যত তাড়াতাড়ি বিলুপ্ত হয়–ততই তাঁকে বুঝতে সুবিধা হবে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ভুক্ত এই ব্রাহ্মদের সঙ্গে হিন্দুদের আকাশ-পাতাল তফাৎ।" (মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ঃ রবি-পরিক্রমা, পৃঃ ৫৪)।

রবীন্দ্রনাথ নিজে এ সম্পর্কে কী বলেছেন তা তাঁর 'পরিচয়' গ্রন্থের 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করছি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ঃ

"হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানদের যদি বিরোধ থাকে, তবে আমি হিন্দু নই বলিয়া সে বিরোধ মিটাইবার ইচ্ছা করাটা অত্যন্ত সহজ পরামর্শ বলিয়া শোনায়, কিন্তু তাহা সত্য

www.pathagar.com

পরামর্শ নহে। যে আপনাকে পর করে, সে পরকে আপনার করে না, যে আপন ঘরকে অস্বীকার করে, কখনই বিশ্ব তাহার ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করতে আসে না, নিজের পদরক্ষার স্থানটুকুকে পরিত্যাগ করার দ্বারাই যে চরাচরের বিরাট ক্ষেত্রকে অধিকার করা যায়, একথা কখনই শ্রদ্ধেয় হতে পারে না।"

এখানে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে একজন হিন্দু রূপেই পরিচয় দিয়েছেন, হিন্দুত্বকে পরিহার করে তিনি নিজেকে পরগাছা ভাবতে সম্মত হননি। ঘরে-বাইরে-বহির্বিশ্বে নিজেকে তিনি হিন্দু বলে পরিচয় দিতেই গৌরববোধ করতেন। শেষ জীবনে তিনি তাঁর কথা ও কাজে এ পরিচয়কে আরো স্পষ্ট করে তোলায় তাঁর অতিভক্তরা খানিকটা মনঃক্ষুণ্ন হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল কাজী আবদুল ওদুদের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

"রবীন্দ্রনাথের জন্ম এক মহৎ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হিন্দুধর্মের সংস্কারকের পুত্ররূপে। পিতার ব্যক্তিত্ব চিরদিন তাঁর অন্তরে জাগিয়েছে সম্ভ্রম আর প্রেরণা। ...রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক নিসর্গপ্রীতি আর বঙ্কিমের প্রবর্তিত চিন্তাধারার প্রতি আহৃত বিরূপতা হয়ত নিরূপিত করেছিল তাঁর প্রতিভার গতিপথ। পরবর্তীকালে অবশ্য এমন সময় রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় এসেছিল, যখন প্রায় বঙ্কিমচন্দ্রের ধরনের হিন্দু জাতীয়তাবাদী তিনি হয়ে পড়েছিলেন।" (কাজী আব্দুল ওদুদ ঃ শাশ্বত বঙ্গ, পৃ. ৭৩)।

কবি রবীন্দ্রনাথকে দয়ার প্রতিমূর্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু অধ্যাপক অমিতাভ চৌধুরী তাঁর 'জমিদার রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সামন্তবাদী প্রজাপীড়ক জমিদার ছিলেন। তাঁর দফায় দফায় খাজনা বৃদ্ধি এবং জোরজবরদস্তি করে তা আদায়ের বিরুদ্ধে ইসমাইল মোল্লার নেতৃত্বে শিলাইদহে প্রজা বিদ্রোহ হয়েছিল। মুসলমান প্রজাদের টিট করার জন্য নমঃশূদ্র প্রজা এনে বসতি স্থাপনের সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি রবীন্দ্রনাথের মাথা থেকেই বের হয়েছিল।"

বঙ্কিমের মত হিন্দু জাতীয়তাবাদী হতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথও মুসলিম-বিদ্বেষী হয়ে ওঠেন। তাই তাঁর বিভিন্ন লেখায় একদিকে তিনি যেমন হিন্দুধর্ম, বৈদিক আদর্শের মাহাত্ম্য প্রচারে পঞ্চমুখ হয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি মুসলমানদেরকে 'যবন' 'ম্লেচ্ছ' প্রভৃতি তুচ্ছাত্মক শব্দের দ্বারা গালি দিয়েছেন। মুসলমানদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য টডের রাজস্থানের মিথ্যা কাহিনী নিয়ে তিনি মুসলমান বীরের প্রতি জঘন্য রসিকতা করে 'হোরিখেলা' কবিতাটি রচনা করেন, শিখদের আত্মত্যাগের উৎকৃষ্ট নযীর প্রদর্শনার্থে মোগলদেরকে 'মত্ত মোগল রক্ত পাগল' বিশেষণে আখ্যায়িত করে 'বন্দী বীর' কবিতাটি লেখেন। হিন্দু জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হওয়ার কারণেই তিনি মারাঠা-দস্যু শিবাজীকে মারাঠা বীর রূপে বন্দনা করে তাকে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের প্রাণ-পুরুষ হিসাবে তুলে ধরেন। 'শিবাজী উৎসব' শীর্ষক কবিতায় তিনি লেখেন ঃ

www.pathagar.com

"সেদিন শুনিনি কথা – আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি লব।
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্ব দেশ
ধ্যানমন্ত্রে তব।
ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরবসন-
দরিদ্রের বল।
'একধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে' এ মহাবচন
করিব সম্বল।।"

'এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে'– এ উক্তির দ্বারা রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনোভাব সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। অখন্ড ভারতে একমাত্র হিন্দুধর্ম বা হিন্দুত্বের আদর্শেই এ ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের সে ধর্মরাজ্যে ইসলাম বা অন্য কোন ধর্ম বা অহিন্দুর কোন স্থান নেই। সকলকেই অভিন্ন হিন্দুধর্ম রাজ্যে আপনাপন স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে 'একদেহে লীন' হবার আহ্বান জানিয়েছেন। অন্য ধর্ম বা ধর্মাবলম্বীদের প্রতি রবীন্দ্রনাথ কতটা অসহিষ্ণু ও বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন এ থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'বন্দী বীর' কবিতায় কবি লিখেছেন ঃ

"সেদিন কঠিন রণে
'জয় গুরুজীর' হাঁকে শিখবীর সুগভীর নিঃস্বনে।
মত্ত মোগল রক্ত পাগল 'দীন দীন' গরজনে।"

'পূজারিনী' কবিতায় কবি বলেন ঃ

"চলেছি করিতে যবন নিপাত,
যোগাতে যমের খাদ্য।"

হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্থান, হিন্দুত্বের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে একই সাথে যবন নিধন ও ম্লেচ্ছদের ইসলাম-মাহাত্ম্যের কাল্পনিক পরাভব সাধনে কবি এক ধরনের পাশবিক উল্লাস লাভ করেছেন। তাই তিনি লিখেছেন ঃ

"বলিতে পার, কাহার প্রতাপে এই অগণিত যবন সৈন্য প্রচণ্ড বাত্যাহত অরণ্যানীর ন্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল? কাহার বজ্র, মন্দ্রিত 'হর্ হর্ বোম' শব্দে তিন লক্ষ ম্লেচ্ছ কণ্ঠের 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি নিমগ্ন হইয়া গেল?" (রীতিমত নভেল)।

সাম্প্রদায়িকতা রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-কল্পনাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যে তিনি বঙ্কিমের মতোই ইতিহাস-বিকৃতি ঘটিয়ে হিন্দুত্বের চরম পরাকাষ্ঠা এবং ইসলাম ও মুসলমানদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার নির্লজ্জ বেসাতীপনায় এতটুকু কসুর করেননি। এখানে তাঁর 'দুরাশা' গল্প থেকে সামান্য উদ্ধৃতি দিচ্ছি। এখানে কবি তাঁর গল্পের নায়িকা নওয়াবজাদী নূরউন্নিসার মুখ দিয়ে বের করেছেন ঃ

"আমার হিন্দু দাসীর নিকট হিন্দু ধর্মের সমস্ত আচার-ব্যবহার, দেবদেবীর সমস্ত আশ্চর্য কাহিনী, রামায়ণ-মহাভারতের সমস্ত ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া শুনিতাম, শুনিয়া

www.pathagar.com

সেই অন্তঃপুরের প্রান্তে বসিয়া হিন্দু-জগতের এক অপরূপ দৃশ্য আমার মনের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইত। মূর্তি, শঙ্খ ঘন্টা ধ্বনি, স্বর্ণচূড়া খচিত দেবালয়, ধূপধুনার ধূম, অগুরু চন্দন, মিশ্রিত পুষ্পরাশির সুগন্ধ, যোগী-সন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতা, ব্রাহ্মণের অমানুষিক মাহাত্ম্য, মানুষ ছদ্মবেশধারী দেবতাদের বিচিত্র লীলা—সমস্ত জড়িত হইয়া আমার নিকট এক অতি পুরাতন, অতি বিস্তীর্ণ, অতি সুদূর অপ্রাকৃত মায়ালোক সৃজন করিত। আমার চিত্ত যেন নীড়হারা ক্ষুদ্র পক্ষীর ন্যায় প্রদোষকালের একটি প্রকাণ্ড প্রাচীন প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইত। হিন্দু সংসার আমার বালিকা হৃদয়ের নিকট একটি পরম রমণীয় রূপকথার রাজ্য ছিল।"

গরজ বড় বালাই। মুসলিম ঘরের একজন হিন্দু দাসীর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মের সকল মাহাত্ম্য ও গুণপনা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। সে দাসীও আবার হিন্দুধর্মের সকল মহা মহা গ্রন্থ বেদ-উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত ও তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর অসাধারণ লীলা-মাহাত্ম্য সম্পর্কে সুপণ্ডিত! এরূপ সুপণ্ডিত, ধর্মবেত্তা হিন্দু রমণীর পক্ষে কোন মুসলিম গৃহে পরিচারিকা হওয়া মোটেই শোভা পায় না। কিন্তু হিন্দুধর্মের কাল্পনিক মাহাত্ম্য বর্ণনা ও সেই সাথে ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস ও চরিত্রে কলংক লেপনের 'মহৎ ব্রত' সুসম্পন্ন করার আত্যন্তিক গরজে রবীন্দ্রনাথ তাকে মুসলিম নওয়াবজাদীর পরিচারিকা পদে সমাসীন করে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব তাকে দিয়ে সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নওয়াবজাদীকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন ঃ "বিশ্বাসঘাতক পিতার গৃহ আমার নরকের মত বোধ হইল।"

রবীন্দ্রনাথ এখানেই শেষ করেননি। মুসলিম পিতার গৃহ 'নরকের মত বোধ' হবার পর নওয়াবজাদীকে ব্রাহ্মণ-পুত্র কেশর লালের প্রেমে আকৃষ্ট করে ঘর-ছাড়া করে কেশব লালের পদসেবায় নিয়োজিত করা হলো। কিন্তু তাতেও রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্য সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত না হওয়ায় যমুনা থেকে জল এনে কেশর লালের অবচেতন দেহ ও চোখে-মুখে বার কয়েক সিঞ্চন করে নওয়াবজাদী যখন কেশর লালের চেতনা ফিরিয়ে এনে প্রেমভাবে গদগদ হয়ে বললেন, 'আরও জল দিব?' কেশর লাল তখন বললেন, 'কে তুমি?' নওয়াবজাদী বললেন, 'অধীনা আপনার ভক্ত সেবিকা, নওয়াব গোলাম কাদির খাঁর কন্যা।' নওয়াবজাদীর পরিচয় পেয়েই কেশর লাল সিংহের ন্যায় গর্জন করে উঠলো—'বেঈমানের কন্যা, বিধর্মী! মৃত্যুকালে যবনের জল দিয়া তুই আমার ধর্ম নষ্ট করিলি?'

এখানে রবীন্দ্র-মানসের যথার্থ পরিচয় ফুটে উঠেছে। হিন্দুত্বের মিথ্যা অহমিকার কাছে 'মানবতাবাদী' রবীন্দ্রনাথের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটেছে। তাই রবীন্দ্র-ভক্ত কাজী আবদুল ওদুদ অনেকটা আফসোসের সুরে হলেও যথার্থই বলেছিলেন, 'প্রায় বঙ্কিমচন্দ্রের ধরনের হিন্দু জাতীয়তাবাদী তিনি হয়ে পড়েছিলেন।'

রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিকে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেন। সে ধারণা থেকেই তিনি ১৩১৭ সনে 'ভারততীর্থ' কবিতা লিখে গ্রীক, শক,

www.pathagar.com

হুনদের মত মুসলমানদেরকেও হিন্দুদের সাথে মিলিত হয়ে একাকার হবার আহ্বান জানান। কিন্তু পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেন যে, মুসলমানরা এমন একটি জাত যে তার আদর্শ ও সেই আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে পরিগঠিত জীবনায়নকে কখনো বিস্মৃত হয় না। তাই শেষ পর্যন্ত গভীর বেদনার্ত চিত্তে তিনি লেখেন ঃ

"ভারতবর্ষের এমনই কপাল যে এখানে হিন্দু-মুসলমানের মত দুই জাত একত্র হয়েছে। ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল, আচারে মুসলমানদের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। এক পক্ষের যেদিকে দ্বার খোলা, অপর পক্ষের সেদিকে দ্বার রুদ্ধ। এরা কী করে মিলবে।" (শান্তিনিকেতন পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩২৯)।

কবি রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের পূর্ণ মুসলমান হয়ে থাকাটা বোধ হয় পছন্দ করতেন না। সেজন্য তিনি বলতেন- 'মুসলমানরা ধর্মে ইসলাম অনুরাগী হলেও জাতিতে তারা হিন্দু। কাজেই তারা 'হিন্দু-মুসলমান'। [আবুল কালাম সামসুদ্দিন ঃ 'অতীত দিনের স্মৃতি']

"ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে সহানুভূতিশীল তেমন কিছু লেখার প্রয়োজনও তিনি অনুভব করেননি। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে তাঁর বোধোদয় ঘটে। একবার ভারতের বোম্বাই শহরে পয়গম্বর দিবস (১৯৩৩, ২৬ ডিসেম্বর) উদযাপন হয়। সেবার কবি রবীন্দ্রনাথ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পক্ষে একটি বাণী পাঠান। সেটি পাঠ করে শোনান খ্যাতনামা কংগ্রেস নেত্রী সরোজিনী নাইডু। বাণীতে লেখা হয় 'জগতে যে সামান্য কয়েকটি মহান ধর্ম আছে, ইসলাম ধর্ম তাদেরই অন্যতম। ... সত্য ও শাশ্বতকে যাঁরা জেনেছেন ও জানিয়েছেন, তাঁরা ঈশ্বরের ভালবাসার পাত্র এবং মানুষকেও তাঁরা চিরকাল ভালবেসে এসেছেন।' ১৯৩৪-এর ২৫ জুন হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) জন্মদিন উপলক্ষে কবি আরও একটি বাণী পাঠান। সেটি আকাশবাণী রেডিওতে প্রচার করা হয়। বাণী পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেন স্যার আব্দুল্লাহ সোরাবর্দী। সেই বাণীর শেষ বাক্যটি হলো... 'আজকের এই পুণ্য অনুষ্ঠান উপলক্ষে মুসলিম ভাইদের সঙ্গে একযোগে ইসলামের মহাঋষির [হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)] উদ্দেশে আমার ভক্তি উপহার অর্পণ করে উৎপীড়িত ভারতবর্ষের জন্য তার আশীর্বাদ ও সান্ত্বনা কামনা করি।' স্যার আব্দুল্লা ঐ বক্তব্যটি ছেপে জনগণের মধ্যে পরিবেশন করেছিলেন।" [অমিতাভ চৌধুরী ঃ ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ]

রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের সাগর-তীরে সকল ভারতীয়দেরকে 'এক দেহে লীন' হবার আহ্বান জানালেও এটা তিনি ভাল করেই জানতেন যে, সেটা কোন মতেই সম্ভব নয়। তাই অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

"India is too vast in its area and too diverse in its races. It is many countries packed in one geographical receptacle. It is just the opposite of what Europe truly is, namely, one country made into

www.pathagar.com

many.Thus Europe in its culture and growth has made the advantage of the strength of the one. On the contrary, being naturally many. Yet adventitiously one, has all along suffered from weakness of its diversity and feebleness of its unity. (Nationalism in India, Rabindranath Tagore).

রবীন্দ্র-মানস যে হিন্দুত্ব ও হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিল তা বুঝতে অনেকেই ভুল করেছেন অথবা এড়িয়ে গেছেন। একদিকে, তিনি হিন্দু-মুসলমানকে 'এক দেহে লীন' হবার আহ্বান জানালেও অন্যদিকে, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথে যে সব প্রতিবন্ধকতা তা দূরীকরণে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল বলে মনে হয় না। ইংরেজ আমলের শুরু থেকে দীর্ঘকাল ধরে মুসলমানরা সীমাহীন জুলুম-বঞ্চনা-নির্যাতন ভোগ করার পর ১৯৩৭ সনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হককে প্রধানমন্ত্রী করে কলকাতায় কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। হক-মন্ত্রীসভা ১৯৩৮ সনে ঋণসালিসী বোর্ড স্থাপন, ১৯৩৯ সনে প্রজাস্বত্ব আইন পাশ, ১৯৪০ সনে মহাজনী আইন পাশসহ বহুবিধ জনকল্যাণমূলক আইন পাশ করে। এতে এতকাল ধরে অধিকার-বঞ্চিত, শোষিত, নির্যাতীত মুসলমানরাই অধিক লাভবান হয়। হক মন্ত্রীসভা রাজবন্দীদের মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত নেয়ায় বহু সন্ত্রাসী ও বিপ্লবী ছাড়া পায়। এছাড়া, রবীন্দ্রনাথের জন্য সর্বাধিক দুঃশ্চিন্তার কারণ ছিল শেরেবাংলার নেতৃত্বাধীন কৃষক প্রজাপার্টির বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের প্রস্তাব। এতে জমিদার রবীন্দ্রনাথের আঁতে ঘা লাগে। জমিদারী হারানোর ভয়ে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এ কারণে তিনি একটি চিঠিতে (চিঠি ১৩৪৬ সনে 'প্রবাসী' পত্রিকায় ছাপা হয়) রবীন্দ্রনাথ লেখেন ঃ

"...আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে সম্প্রতি রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় মুসলমান কর্তৃত্বের উপলক্ষে সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক শাসনের যে নতুনত্ব রুদ্রমূর্তি ধরল, তার উপরে যদি সোভিয়েট বা নাজি শাসন চালানো না যায়, তাহলে তো নৌকাডুবি হবে।"

৪ঠা মার্চ, ১৩৩৬ তারিখে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন ঃ "...ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি লক্ষ্য করলে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ সাধনকে পূণ্য কর্মই বলা যায়। বিশ্ব-মুসলমানির প্রচেষ্টাও সেই লক্ষ্য অভিমুখে। প্যান-ইসলামীয় প্রচেষ্টা ভারত সাম্রাজ্যের অনুকূল নয়। তার অর্ঘ্য রাজদ্বার পেরিয়ে চলে যায়।"

একদিকে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কথা বলা, অন্যদিকে, শাসন-ব্যবস্থায় মুসলিম কর্তৃত্বকে সাম্প্রদায়িক ভাবা, হিন্দু-মুসলিম বিরোধকে 'পুণ্যকর্ম' মনে করা সম্পূর্ণ স্ববিরোধিতা। রবীন্দ্রনাথে এরূপ স্ববিরোধিতা নতুন কিছু নয়। এরূপ স্ববিরোধিতা রবীন্দ্র-সাহিত্যে ও তাঁর জীবনে অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এক সময় হিন্দু লেখকদের লেখা বিভিন্ন পাঠ্য-পুস্তক, নাটক-নভেল-কাব্য-প্রবন্ধে জঘন্য মুসলিম-বিদ্বেষ ও উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রচার চলছিলো, তখন এ ব্যাপারে

www.pathagar.com

কতিপয় মুসলিম নেতা রবীন্দ্রনাথের সুদৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলে তিনি সম্পূর্ণ নিস্পৃহভাবে বলেন ঃ "মুসলমান গ্লানিপূর্ণ বলে আমরা আপন সাহিত্য বর্জন করিতে পারিনা। মুসলমানদের স্বতন্ত্র সাহিত্য গড়িয়া লওয়া উচিত।" (টাঙ্গাইলের ধনবাড়ির জমিদার সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর লেখা চিঠির উত্তরে)।

অনেকেই আফসোস করে থাকেন যে, রবীন্দ্রনাথ মুসলমান সমাজ সম্পর্কে কিছু লেখেননি। কথাটা বহুলাংশে সত্য হলেও সর্বাংশে সত্য নয়। মুসলমানদেরকে মাঝে-মধ্যে কবিতা-গল্পে 'যবন' 'ম্লেচ্ছ' বলে কষে গাল দেয়া থেকে মনে হয় তিনি তাদেরকে একেবারে ভুলে যাননি। নিকৃষ্ট শ্রেণীর বা কোন তুচ্ছ চরিত্র রূপায়ণেও তিনি যথারীতি প্রতিবেশী মুসলমানদের দ্বারস্থ হয়েছেন। এর দ্বারা তাঁর চরম মুসলিম-বিদ্বেষ এবং কারণে-অকারণে মুসলমানদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা বা সামাজিকভাবে তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার রবীন্দ্র-মানস প্রবণতার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রখ্যাত 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে রহমত কাবুলির চিত্র এঁকে দেখালেন, মুসলমানরা একটা গুণ্ডার জাত, কথায় কথায় কারণে-অকারণে অপরের বুকে ছুরি মারতে তারা ওস্তাদ। রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদেরকে মার-দাঙ্গায় অভ্যস্থ একটি বর্বর জাতি বলেই মনে করতেন। তাঁর লেখা 'সমস্যা' নামক একটি প্রবন্ধে তাঁর এ মনোভাবই ফুটে উঠেছে। এতে তিনি লিখেছেন ঃ "কোন বিশেষ প্রয়োজন না থাকলেও হিন্দু নিজেকে মারে, আর প্রয়োজন থাকলেও হিন্দু অন্যকে মারতে পারে না। আর মুসলমান কোনো বিশেষ প্রয়োজন না ঘটলেও নিজেকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে, আর প্রয়োজন ঘটলে অন্যকে বেদম মার দিতে পারে।"

কলকাতা, জামালপুরসহ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু-মুসলিম ভয়াবহ দাঙ্গা সংঘটিত হবার পর রবীন্দ্রনাথ এ ধরনের উস্কানীমূলক বক্তব্য পেশ করেন। এরদ্বারা সেই নাজুক পরিস্থিতিতে যে কীরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে রবীন্দ্রনাথ কি তা জানতেন না? জানতেন এবং জানতেন বলেই মুসলিম হত্যায় হিন্দুদেরকে এরূপ উস্কানী দিয়েছেন তিনি। এটাকে রবীন্দ্র-মানসের এক ধরনের বিকারগ্রস্ততা ছাড়া আর কি বলা যায়!

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মুসলিম জাতি হচ্ছে মধ্যযুগীয় বর্বর অসভ্য জাতি, তারা বাহুবলে রাজ্য জয় করলেও মানবজাতিকে কোন নতুন সভ্যতা দিয়ে যেতে পারেনি। তিনি তাঁর 'কালান্তর' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ "সে মুসলমানও প্রাচ্য, সেও আধুনিক নয়। সেও আপন অতীত শতাব্দীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাহুবলে সে রাজ্য সংগঠন করেছে, কিন্তু তার চিত্তে সৃষ্টি-বৈচিত্র্য ছিল না।"

রবীন্দ্রনাথের এ উক্তি যে সত্যের জঘন্য অপলাপ অথবা প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাবের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ইতিহাস সম্পর্কে যাদের সামান্য জ্ঞান আছে তারাই

www.pathagar.com

সেটা উপলব্ধি করবেন। একথা সর্বজনবিদিত যে, ইসলাম প্রচারের মূলে ইসলামের চিরন্তন সর্বোৎকৃষ্ট মানবিক আদর্শ এবং ইসলামের মহান নবীর (স) অতুলনীয় চরিত্র-মাধুর্যই দায়ী। অবশ্য ইসলামের মহান নবী (স) এবং খুলাফায়ে রাশিদীন কখনো কখনো প্রয়োজনে অস্ত্রধারণ করেছেন, কিন্তু সেটাও আত্মরক্ষার জন্যই। এটাও বিশ্ববাসীর নিকট ইসলামের একটি শিক্ষা যে, ইসলাম আক্রান্ত না হলে কখনো যুদ্ধ করে না। আত্মরক্ষার্থে অস্ত্রধারণ মানবিক অধিকার এটা সর্ববাদীসম্মত নীতি। ইসলাম সর্বদাই শান্তির সপক্ষে। তবে প্রয়োজনে অশান্তি, অন্যায়, জুলুম, অবিচার, বিশৃঙ্খলা, অমানবিকতা নির্মূল করে এ পৃথিবীকে মানুষের বাসপযোগী করে তোলার জন্য ইসলাম ন্যায়-যুদ্ধে অবশ্যই অংশগ্রহণ করে থাকে। ইসলামের পরিভাষায় এটাকে 'জিহাদ' বলা হয়। জিহাদ করা ফরয। জিহাদ ব্যতীত এ পৃথিবী দানবের করতলগত হতে বাধ্য, যা কখনো কোন বিবেকবান মানুষের কাম্য হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত ইসলাম আরবের জাহেলী সমাজে কী এক অসাধারণ আলোকিত, জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা-সভ্যতায় সমুন্নত, মানবিক মহত্তম সমাজ গঠন করেছিল ইতিহাস-অভিজ্ঞ মাত্রেই তা অবগত। শুধু আরব কেন, ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়াসহ সমগ্র বিশ্ব-সভ্যতা তথা জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইসলামের অফুরন্ত অবদানের কথা কে না জানে! আধুনিক সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে মুসলমানদের অবদানের কথা বিশ্বময় সকলেরই জানা। সমগ্র ইউরোপ যখন অজ্ঞানতার ঘনান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, তখন মুসলমানরাই জ্ঞানের বাতি জ্বালিয়ে সমগ্র বিশ্বে নতুন সভ্যতার আলোকিত ভুবন রচনা করে চলছিল। স্পেনের মুসলমানদের কাছ থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দীক্ষা গ্রহণ করে ইউরোপে নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটে। আমেরিকা ছিল তখনো সভ্য-জগতের নিকট অনেকটা অপরিজ্ঞাত। সমগ্র বিশ্বে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার বিকাশ ও ক্রমবিস্তারে ইসলাম ও মুসলমানদের অবদানের কথা সকলেরই জানা। রবীন্দ্রনাথ সেটা অস্বীকার করেন কী ভাবে?

এমনকি, এ উপমহাদেশের মানুষদের যখন পাক-পবিত্রতার জ্ঞান ছিল না, উন্নত রন্ধন-প্রণালী, রুচিসম্পন্ন পোশাক, সুরম্য অট্টালিকা-সৌধ-স্থাপত্য ইত্যাদি নির্মাণের কৌশল জানা ছিল না, তখন মুসলমানরা এসেই এখানে এক নতুন সভ্যতার পত্তন ঘটায়। স্থাপত্য, সঙ্গীত, সাহিত্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভারতীয় মুসলমানদের অবদান বিশ্বখ্যাত। যে ভাষায় সাহিত্য-চর্চা করে রবীন্দ্রনাথ 'নোবেল পুরস্কার' পান বা বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন সে ভাষাও মুসলমানদের হাতে নবজন্ম লাভ করে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায় 'দ্বিজের ন্যায়' সম্মান লাভ করে। মুসলিম আগমনের পূর্বে উপমহাদেশের মানুষ ছিল পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী, নানা দেব-দেবীর মূর্তি বানিয়ে তারা পূজা করত। ধর্মের নামে জাতিভেদ প্রথা সৃষ্টি করে এক শ্রেণীর মানুষ অন্য শ্রেণীর

www.pathagar.com

মানুষের উপর প্রভুত্ব করত, উচ্চবর্ণের মানুষের নিকট নিম্নবর্ণের মানুষ মানবিক আচরণ পাওয়া দূরে থাক, পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট আচরণ লাভ করতো। সে ধরণের একটি অমানবিক ও চরম অধ:পতিত সমাজে মুসলমানরা এসে মানবিক ধর্ম ইসলাম প্রচার করে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও ইনসাফপূর্ণ এক উন্নত মানবিক সমাজ গড়ে তুলল। যে মুসলমানদের কল্যাণে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পুরুষগণ সভ্যতা-ভব্যতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে 'বাবু' সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে সম্মান ও বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হন তাদের সম্পর্কে কবির এরূপ অজ্ঞতাপূর্ণ বিকৃত ধারণা ও বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য অনেকটা বিস্ময়কর বৈকি!

রবীন্দ্রনাথ জমিদার ছিলেন। পূর্ববঙ্গে তাঁর জমিদারীর অধিকাংশ প্রজা ছিল দরিদ্র মুসলমান। তিনি তাদের দারিদ্র্য দূরীকরণে ন্যূনতম কোন কর্মসূচীও গ্রহণ করেননি। বরং খাজনার হার বাড়িয়ে, মুসলমান প্রজাদের উপর পূজার কর আদায় করে তাদের দারিদ্র্য ও ধর্মবোধের প্রতি উপহাস করেছেন। দরিদ্র অসহায় অশিক্ষিত মুসলিম প্রজাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে সামাজিক উন্নয়নে তাদেরকে সহযোগী করার জন্য তিনি তাদের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও স্থাপন করেননি। অথচ মুসলমানদের নিকট থেকে আদায়কৃত বিপুল পরিমাণ করের টাকায় তিনি শান্তিনিকেতনে 'বিশ্বভারতী' গড়ে তুলে বৈদিক আদর্শে হিন্দুধর্ম-সংস্কৃতি-দর্শন শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা করেছেন। নিজ ধর্মের প্রতি অনুরাগ থাকা খারাপ কিছু নয়। কিন্তু তিনি নিজ ধর্মের প্রতি অনুরাগী হওয়ার সাথে সাথে ছিলেন চরম মুসলিম-বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক হিন্দু। শিবাজী-উৎসব, হোরি খেলা, নিজ জমিদারীতে মুসলমানদের গরু কুরবানীর প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা থেকে এটা সুস্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডক্টর আহমদ শরীফের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করছি ঃ

"শিলাইদহ জমিদারী এলাকায় যেখানে প্রায় সকল রায়তই ছিল মুসলমান, সেখানে গরু কুরবানী নিষিদ্ধ করা কিংবা একতরফাভাবে খাজনা বাড়িয়ে মুসলিম প্রজাদের প্রতিরোধের মুখে তা আদায় করতে ব্যর্থ হয়ে তাদের শায়েস্তা করার জন্য তাদের গ্রামে হিন্দু (নমশূদ্র) প্রজাপত্তন নিশ্চয়ই কোনও উদার অসাম্প্রদায়িকতার প্রমাণ বহন করে না।"(আহমদ শরীফঃ রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র মূল্যায়ন, বাংলা একাডেমীর ত্রৈমাসিক 'উত্তরাধিকার' পত্রিকার বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৯৩ সংখ্যা)।

ডক্টর আহমদ শরীফ উক্ত প্রবন্ধে আরো লিখেছেন ঃ "রবীন্দ্র চরিত-মানস জানবার-বুঝবার জন্য আরো কিছু আপাত তুচ্ছ বিষয় মনে রাখা জরুরীঃ ঊনচল্লিশ বছর বয়সে প্রাচীন ব্রাহ্ম পৌরাণিক ঘটনা নিয়ে এবং বৌদ্ধ, রাজপুত, মারাঠা ও শিখ ইতিবৃত্ত উপকথা নিয়ে তিনি 'কথা ও কাহিনী' কাব্য রচনা করেন। কিন্তু সাড়ে ৭শ' বছরের পুরাতন দেশজ কিংবা বিদেশাগত দরবেশ বা শাসক মুসলিমের কোন ব্যক্তিগত

www.pathagar.com

কৃতি কিংবা গুণ মান মাহাত্ম্য তাঁর কাব্য প্রেরণার উৎস হয়নি। এমনকি আকবর বাদশাহ কিংবা মঈন উদ্দিন চিশতী, রাজিয়া, নূরজাহানও নন। ৬শ' বছর ধরে প্রবল প্রতাপ এমন এক বিদ্যা ও বিত্তবান জ্ঞান-কৃতি কীর্তি বহুল জাতির বা সম্প্রদায়ের কিছুই তাঁর (তাজমহলই ব্যতিক্রম) আবেগ উদ্রিক্ত করতে পারেনি, এতে মনে হয় বিদেশাগত এ শাসকগোষ্ঠীর প্রতি তাঁর অন্তরের গভীরে প্রচণ্ড ঘৃণা-বিদ্বেষ বা স্থায়ী অশ্রদ্ধা ছিল অথচ শাসক ইংরেজের প্রতি তাঁর এ বিদ্বেষ দেখা যায় না, বরং ইংরেজের প্রতি ছিল তাঁর অপরিমেয় অনুরাগ ও গভীর আস্থা আর নিবিড় শ্রদ্ধা। তাঁর রাজনীতি বিমুখতা, দেশে সুশাসন ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আগ্রহাভাব, স্বাধীনতা আন্দোলনে নিরুৎসাহ প্রভৃতির কিছু কারণও জমিদার কবির এই ইংরেজ প্রীতি।....

"ব্রিটিশের সুশাসন ও সুপোষণের প্রত্যাশী ছিলেন তিনি। রাজকুটুম্ব, ঘুষোঘুষি, স্বদেশী সমাজ প্রভৃতি প্রবন্ধ স্মর্তব্য। মনে রাখতে হবে, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড তাঁকে নাইটহুড ত্যাগের মধ্যে বিচলিত করেনি, ভিতরকার চাপে সিদ্ধান্ত নিতে তার ছেচল্লিশ দিন লেখেছিল।

"চল্লিশ বছর বয়স্ক কবি রাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে রাজভক্তির প্রতীক মাতৃশোকোচ্ছ্বাস রচনা করেন, 'নাইট' উপাধি পেয়ে আনন্দিত ও ধন্য হন এবং বঙ্গভঙ্গ রদ করায় সম্রাট পঞ্চম জর্জের উদ্দেশ্যে ভারতীয় হিন্দুর পক্ষে কৃতজ্ঞ কবি উচ্ছ্বসিত ভাষায় 'জনগণমন অধিনায়ক' প্রশস্তিটি ১৯১১ সনে রচনা করেন।" শিলাইদহে গরু কুরবানী নিষিদ্ধ করলেও স্থানীয় দেবী কাত্যায়নীর (মা কালী) পূজা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতা বিস্ময়কর। অধ্যাপক ডক্টর মযহারুল ইসলাম লিখেছেন ঃ "শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ পৌষ মেলার প্রবর্তন করেন ১৮৯৪ সালের ডিসেম্বরে। তারই অনুসরণে শিলাইদহে স্থানীয় দেবী কাত্যায়নীর পূজা উপলক্ষে ১১০২ সালে ১৫ দিনব্যাপী স্বদেশী মেলার প্রবর্তন করেন, যেখানে লাঠিখেলা ও যাত্রাভিনয় প্রাধান্য পায়। ওই মেলাতেই রাখীবন্ধন ব্যবস্থাও চালু করা হয়। বর্তমান বাংলাদেশের চাঁদপুরের অধিবাসী নামকরা স্বদেশী এবং বাগ্মী কালীমোহন ঘোষকে কবি কাছে নিয়ে আসেন এই স্বদেশী মেলা উপলক্ষে। কবিগুরুর নির্দেশে তিনি সর্বক্ষণ গ্রামে গ্রামে ঘুরে শত শত যুবককে স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত করেন।"-(মযহারুল ইসলাম ঃ কর্মযোগী রবীন্দ্রনাথ, দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা,বৃহস্পতিবার, ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৭)।

পিতা দেবেন্দ্রেনাথ কেন চৌদ্দ নম্বর সন্তান রবীন্দ্রনাথকে জমিদার হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন? এটাও কম বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। তাহলে কী ধরে নিতে হবে শাসন-শোষণ, অত্যাচার ও ছলচাতুরীতে, কুটকৌশলে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন যোগ্যতম? অনেকের মতে, পিতৃদেব ভুল করেননি। জমিদারদের বিরুদ্ধে কলম ধরলে নেমে আসতো অত্যাচারের খড়্গ। নির্ভীক সাংবাদিক কুষ্ঠিয়ার হরিনাথকে অনেক অত্যচার সহ্য করতে

www.pathagar.com

হয়েছে। অপরাধ সত্য কথা বলা। তিনি তাঁর 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' পত্রিকায় জমিদারদের নির্মম চরিত্র তুলে ধরে ছিলেন। কটাক্ষ করে লেখেন- 'ধর্ম মন্দিরে ধর্মালোচনা। আর বাহিরে আসিয়া মনুষ্য শরীরে পাদুকা প্রহার একথা আর গোপন করিতে পারি না।" [অশোক চট্টোপাধ্যায় ঃ প্রাক-বৃটিশ ভারতীয় সমাজ]

তিনি আরো লেখেন, "ইত্যাদি নানা অত্যাচার দেখিয়া বোধ হইল পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়স্থ মৎস্যের যেমন মা-বাপ নাই; পশুপক্ষী ও মানুষ, যে জন্তু যে প্রকারে পারে মৎস্য ধরিয়া ভক্ষণ করে, তদ্রূপ প্রজার স্বত্ব হরণ করিতে সাধারণ মনুষ্য দূরে থাকুক যাঁহারা যোগীঋষি ও মহা বৈষ্ণব বলিয়া সংবাদপত্র ও সভা-সমিতিতে প্রসিদ্ধ তাঁহারাও ক্ষুৎক্ষামোদর।' [কাঙাল হরিনাথের- 'অপ্রকাশিত ডায়েরী]' এসব মহর্ষীর সঙ্গে তখনকার অফিসার, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরা ম্যাজিস্ট্রেটদের দহরম-মহরম সম্পর্ক থাকায় তারা কঠোর পদক্ষেপ নিতেন না। যারা নিতেন তাদের বদলি কিংবা চাকরিচ্যুতির ভয় থাকতো। জমিদারদের কাজকর্মের সাফাই গাওয়ার জন্য বেশকিছু সংবাদপত্র সক্রিয় ছিল। যেমন- 'হিন্দুরঞ্জিকা', 'হিন্দুহিতৈষিনী', 'দেশহিতৈষী', 'হেরম্ভ', 'বেঙ্গল হরকরা', 'আপার ইন্ডিয়া গেজেট', 'বঙ্গদূত', 'সুধাকর' প্রভৃতি। এগুলো ছিল জমিদারদের সাহায্য-সহযোগিতাপুষ্ট। প্রজারা বিদ্রোহ করলে অলীক কল্পকথা রচনা করে জমিদারদের দায়ী না করে প্রজাদের ওপর চাপানো হতো। এদের মধ্যে পান্ডা হিসেবে কাজ করত অমৃতবাজার পত্রিকা।" [ডাঃ বিনয় ঘোষ ঃ সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, তৃতীয় খন্ড]

"গরীব প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায়ের ব্যাপারটিও ছিল হৃদয়বিদারক। গরুর গাড়ী চলার সময় ধুলো উড়লে দিতে হতো 'ধুলোট কর', গাছ লাগালে 'চৌথকর, আখের গুড় তৈরী করলে 'ইক্ষুগাছ' কর', মৃত পশু ফেললে 'ভাগাড় কর', নৌকায় মাল ওঠানামা করলে 'কয়ালি', জমিদারদের সঙ্গে দেখা করতে হলে 'নজরানা', হাজতে গেলে 'গারদ সেলামি' ইত্যাদি উদ্ভট করের ব্যবস্থা ছিল।" [শ্রী স্বপন বসু ঃ গণঅসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ]।

স্বদেশী মন্ত্রে কীভাবে দীক্ষাদান করা হতো সে সম্পর্কে ভারতের বোম্বে থেকে প্রকাশিত "দি রেনেসাঁ টু মিলিট্যান্ট ন্যাশনালিজম ইন ইণ্ডিয়া" গ্রন্থে অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ লিখেছেন ঃ "In Bengal patriotism had been fortified by the development of the cult of kali the goddes of strength and destruction in Calcutta the vow of Swadeshi used to be administered at mass meetings in the famous temple of kali."- (Dr. Sankar Ghose: the Renaisance to Militant Nationalism in India: Allied Publication Pvt. Ltd. Bombay 1969. p. 271).

কালীপূজার মাধ্যমে স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষাদান করা হতো। স্বদেশী আন্দোলন ত্বরান্বিত করার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত "সোনার বাংলা" গান রচনা করেন। তাই

www.pathagar.com

কবিতাটি মাতৃবাদ (মা কালীর বন্দনা) এই থিওরীর উপর রচিত। 'সোনার বাংলা'য় বলা হয়েছে ঃ

"ওমা তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে
দে গো তোর পায়ের ধূলা, সে যে আমার মাথার মাণিক হবে।
ওমা গরিবের ধন যা আছে তাই দিব চরণতলে,
মরি হায় হায় রে-"

মাতৃবাদ তৌহিদবাদের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। তাই 'সোনার বাংলা' কবিতায় দেশমাতৃকারূপ দেবী-বন্দনা হিন্দুধর্মের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল হলেও তৌহিদবাদী মুসলমানের জন্য তা স্পষ্টত শের্ক। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মোজাফ্ফর আহমদ ১৯৭৭ সনে ঢাকার খান ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোং প্রকাশিত "আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আমার মনের যে অবস্থা ছিল তার যে রোমান্স সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনে ছিল, তাতে আমার পক্ষে সে আন্দোলনে যোগ দেয়া অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তার পথে দুস্তর বাধা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' হতে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা প্রেরণা লাভ করতেন। এই পুস্তকটির শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। এর মূলমন্ত্র ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম' গান। তাতে আছেঃ

"বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি।।
তোমারই মহিমা গড়ি।
মন্দিরে মন্দিরে।।
তুংহি দূর্গা।
দশপ্রহরণ ধারিণী।।
ইত্যাদি।'

একেশ্বরবাদী কোন মুসলমান ছেলে কি করে এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারে? এ কথাটা কোন হিন্দু কংগ্রেস কোনদিন বুঝতে পারেনি। বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। বারীন্দ্র কুমার ঘোষও আন্দামান হতে ফেরার পর এই কথাই লিখেছিলেন।"

পরাধীন যুগে কোন কোন মুসলমান, এমনকি, মুসলিম নামধারী কমিউনিস্টও 'বন্দেমাতরম' বা তৌহিদ-বিরোধী পৌত্তলিক মাতৃবাদকে মেনে নেয়নি, কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে বিদেশের প্ররোচনায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশীরা স্বাধীনতার উষালগ্নে এক বিশেষ অবস্থায় অনেকটা অসহায়ভাবে 'সোনার বাংলা' গানকে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে মেনে নিতে বাধ্য হয়। এটা আমাদের বিশ্বাসের প্রতি যেমন আঘাত, আমাদের সংস্কৃতির উপরও তেমনি চরমাঘাত। তাই ইসলাম-বিরোধী ও মুসলিম-বিদ্বেষী মহল এবং রবীন্দ্রভক্তরা এতে উল্লসিত। বাংলাদেশে তৌহিদী সংস্কৃতির মূলে

www.pathagar.com

খড়্গাঘাত করে পৌত্তলিক সংস্কৃতির লালন ও বিকাশে এ হলো এক সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র, যার সত্যতা বর্তমান বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে সহজেই প্রতিভাত হবে। এজন্য 'সোনার বাংলা' আমাদের জাতীয় সঙ্গীত নির্বাচিত হবার পর পরই জনৈক রবীন্দ্র-ভক্ত লিখেছিলেন ঃ

"বাংলাদেশের জাতীয়তা আজ ঐতিহাসিক কারণেই রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা'কে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং ইতিহাসের এটাও একটা আশ্চার্য্য ঘটনা যে, একই কবির রচিত দু'টি সঙ্গীত দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রে জাতীয় সঙ্গীত। এর পরেও ভারত ও বাংলাদেশের মৈত্রীর ওপর আঘাত হানবে কে? রবীন্দ্রনাথ এই দুই দেশকে যে রাখীবন্ধনে বেঁধে দিয়েছেন, সেই বাঁধন নিশ্চয়ই অটুট থাকবে।" (বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলাদেশ প্রসঙ্গে ঃ নবজাতক ঃ স্বাধীন বাংলাদেশ সংখ্যা, অষ্টম বর্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৭৮)।

হিন্দু জাতীয়তাবাদে প্রবল বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ইংরেজ-প্রীতিও ছিল অত্যধিক। এ ইংরেজ-প্রীতি তাঁর মধ্যে এসেছিল পারিবারিক ঐতিহ্য হিসাবে। ঠাকুর পরিবারের সামাজিক ও আর্থিক উন্নতির মূলে ছিল ইংরেজ। 'ঠাকুর' পদবীও ইংরেজদের দেয়া। তাই স্বাধীনতার সপক্ষে ঠাকুর পরিবার কখনো সোচ্চার ছিল না। স্বদেশী আন্দোলন, স্বরাজ আন্দোলন ইত্যাদিতে তাদের সমর্থন কখনো জোরালো ছিল না। রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', 'চার অধ্যায়' প্রভৃতি উপন্যাসে সূক্ষ্মভাবে সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করা হয়েছে। এতে সন্ত্রাসবাদীরা খুবই ক্ষিপ্ত হয় এবং তারা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ইংরেজদের দালালী করার অভিযোগ আনে। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ানের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত হলো ঃ

"... রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার পিতৃ-গৃহ, স্বাদেশিকতা নিরপেক্ষ নহে। তাঁহাদের বাড়ী, তাঁহার বাবা ও পরিবারের অনেকেই স্বদেশী আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এবং নানা কর্মের অনুষ্ঠানেও সক্রিয়। আর তাঁহাদের স্বাদেশিকতার আরম্ভ সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনের পর হইতে নয়–তাহার অনেক পূর্ব হইতে। তবু একথা সত্য, ঠাকুর পরিবারের কেউই বিপ্লবী নহেন–স্বাধীনতা আন্দোলনের সৈনিকও নহেন–স্বদেশী আন্দোলনের সহিত সহানুভূতিশীল দেশের মঙ্গলকামী নাগরিক মাত্র। সোম্যেন্দ্রনাথ কিছুকাল হাতুড়ি কাস্তে মার্কা আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু দুর্দিন উপস্থিত হইলে তিনি জার্মানীতে স্থানান্তরিত হন–বৃটিশের কারাগারে নহে। ঠাকুর পরিবারকে অসম্মান হইতে রক্ষা করিতে নাকি তদানীন্তন লাট সাহেব ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ে সোম্যেন্দ্রনাথের এই অন্তরীণ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস, ৩য় প্রকাশ, পৃঃ ৫৫৪-৫)।

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লেখেনঃ "রবীন্দ্রনাথের গানে কবিতায় স্বদেশপ্রেমের অভাব ছিল না, কর্মযোগী অরবিন্দকে শ্রদ্ধাদীপ্ত নমস্কার জানাতেও বিশ্বকবির দ্বিধা ছিল না, কিন্তু বাধা ছিল বিপ্লবীদের সমর্থন জানানোতে

www.pathagar.com

রক্তের ঋণ যারা রক্ত দিয়েই পরিশোধ করতে চান, আত্মদীপণ প্রত্যয়ী অক্রোধ রবীন্দ্রনাথ কোনোমতেই তাদের স্বীকৃতি দিতে পারেননি।" (সাপ্তাহিক 'দেশ', ৪ জুন, ১৯৬৬, কলকাতা)।

বাংলা সাহিত্যের অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) বিখ্যাত 'পথের দাবী' ১৯২৭ সনের ১৫ জানুয়ারী তৎকালীন ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় ঃ "The most powerfull of sedition in almost every page of the book."

'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত হওয়ায় শরৎচন্দ্র অত্যন্ত দু:খিত হন। তাঁর মনে হলো, রবীন্দ্রনাথ যদি বইটির উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে একটু প্রতিবাদ জানান তাহলে হয়তো বইটির উপর থেকে সরকার নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে পারে। এ ভেবে তিনি রবীন্দ্রনাথের সাথে দেখা করে তাঁকে একখানি বই উপহার দেন। কিন্তু এতে হিতে বিপরীত হলো। রবীন্দ্রনাথ বইটি পড়ে শরৎচন্দ্রকে লেখেনঃ

"কল্যাণীয়েষু, তোমার 'পথের দাবী' পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক। অর্থাৎ ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে।.... আমি নানা দেশে ঘুরে এলাম–আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এই দেখলাম–একমাত্র ইংরেজ গভর্নমেন্ট ছাড়া স্বদেশী প্রচার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোন গভর্নমেন্ট এতটা ধৈর্য্যের সঙ্গে সহ্য করে না...ইতি ২৭ শে মার্চ,১৩৩৩-তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

উক্ত চিঠিতে ইংরেজ সরকারের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আনুগত্য সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে না। তিনি নিজে কখনো ইংরেজের বিরুদ্ধে বা পরাধীনতার বিরুদ্ধে একটি বাক্যও উচ্চারণ করেননি। এমনকি অন্যরা তা করুক, সেটাও তিনি পছন্দ করতেন না। যাকে বলা যায় একান্তভাবে ইংরেজ-অনুগত প্রাণ। এ চিঠি পড়ে শরৎচন্দ্র যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন নীচে তা তুলে ধরা হলো ঃ

"রবীন্দ্রনাথ নাকি 'পথের দাবী' পড়ে ইংরেজের সহিষ্ণুতার প্রশংসা করেছেন। এ বইয়েতে নাকি ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষের ভাব আছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। আমার 'পথের দাবী' পড়ে আমার দেশের কবির কাছে যদি এই দিকটাই বড় হয়ে থাকে, তাহলে স্বাধীনতার জন্য আর আন্দোলন কেন? সবাই মিলে তো ইংরেজদের কাঁধে করে নেচে বেড়ান উচিত। হায় কবি, তুমি যদি জানতে তুমি আমাদের কত বড় আশা–কত বড় গর্ব, তাহলে নিশ্চয় এমন কথা বলতে পারতে না। কবির কাছে আমার 'পথের দাবী'র যে এত বড় লাঞ্ছনা হবে, এ আমার স্বপ্নের অতীত ছিল। কি মন নিয়েই যে আমি এই বইখানা লিখেছিলুম, তা আমি কারুকে বুঝিয়ে বলতে পারব না।" [শিশির কর : নিষিদ্ধ বাংলা, পৃ. ২৪,৩২; দরদী শরৎচন্দ্র: মণীন্দ্র চক্রবর্তী; শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা: অবিনাশ চন্দ্র ঘোষাল দ্রষ্টব্য]।

শরৎচন্দ্র তাঁর জীবনকালে তাঁর 'পথের দাবী'র উপর আরোপিত সরকারী নিষেধাজ্ঞার অবসান দেখে যেতে পারেননি। তবে তাঁর মৃত্যুর [১৯৩৮-এর ১৬ই

www.pathagar.com

জানুয়ারী। অল্পকাল পরেই শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের প্রধান মন্ত্রীত্বকালে বাংলা সরকার কর্তৃক 'পথের দাবী'র উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। ১৯৩৯ এর ১৩ মে 'পথের দাবী' নাটকরূপে অভিনীত হয়। অবশ্য পরে ১৯৪০ সনে ঐ নাট্যভিনয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। (দ্রঃ গোলাম আহমাদ মোর্তজাঃ চেপে রাখা ইতিহাস, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৯৯৬, পৃ.২৯৫)।

কবি রবীন্দ্রনাথ ও ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যথেষ্ট স্ববিরোধিতা ছিল। তিনি হিন্দু-মুসলিম মিলনের বাণী শুনাতেন। কিন্তু সে জন্য মুসলমানদেরকে কোন ছাড় দেয়ার পক্ষপাতি ছিলেন না। মুসলমানদের স্বার্থে বঙ্গভঙ্গ হলে তিনি তা রদ করার জন্য আদা-পানি খেয়ে আন্দোলন করেন, পশ্চাৎপদ পূর্ব বাংলার মুসলমানদের শিক্ষার উন্নয়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তিনি কঠোর বিরোধিতা করেন। এ সম্পর্কে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছিঃ "ঔপনিবেশিক বৃটিশ সরকার মূলতঃ প্রশাসনিক সুবিধার জন্য 'বঙ্গদেশকে' দু'ভাগে ভাগ করে পূর্বাংশকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে এবং ঢাকাকে রাজধানী বানিয়ে 'বঙ্গাসাম' প্রদেশ গঠন করে। অবশ্য প্রচার করেছিল যে, পূর্ববঙ্গে জনগণের আর্থিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন করার জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। বঞ্চিত পূর্ববঙ্গের জনগণ অবশ্য এতে দারুণ খুশী হয়েছিল। ঐতিহাসিকেরা তথ্যাদি দিয়ে প্রমাণও দেখিয়েছেন যে, যতদিন এ ব্যবস্থা বলবৎ ছিল ততদিন চাকরী, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মোসলমান-প্রধান পূর্ববঙ্গের আশাতীত উন্নতি হয়েছিল।

"কিন্তু একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষ বঙ্গভঙ্গ মেনে নিতে পারেনি। তারা এর বিরোধিতা করতে থাকে এবং ধীরে ধীরে এ প্রতিবাদ প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। ১৯১১ সালে বৃটীশ সম্রাট পঞ্চম জর্জ দিল্লী দরবারে যোগ দিতে আসেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং মিত্র ভাবাপন্ন গোষ্ঠীকে তুষ্ট করার জন্য 'বঙ্গভঙ্গ' রহিত করা হল, দুই বঙ্গ একত্রিত হল এবং ঢাকা থেকে রাজধানী বিলীন হয়ে গেল। কলিকাতার বাবু সম্প্রদায়ের লোকজন আনন্দে ফেটে পড়ল। কৃতজ্ঞতায় তারা অভিভূত।... ব্রিটিশ রাজন্যবর্গের প্রতি কৃতজ্ঞতার চরম উৎকর্ষের প্রতীক হিসাবে বিশ্বকবি রচনা করেছিলেন তাঁর সেই বিখ্যাত বন্দনা সঙ্গীত, 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা...।'

"পূর্ববঙ্গের উন্নয়ন শুরু হয়েছিল, তা হঠাৎ করেই থেমে যায়। আশাভঙ্গের বেদনায় পূর্ববঙ্গবাসী যখন হতাশ তখন অনেকটা 'গরু মেরে জুতা দানে'র মত ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়ে বলা হল, এতে পূর্ববঙ্গবাসী বিশেষ করে পশ্চাৎপদ মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষায় সহায়তা হবে।

"ঘোষণা দেয়া মাত্র ওপার বাংলায় তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা? কী অলক্ষণে কথা! 'চাষার ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে বাসার চাকরি করবে কারা!'... যে ২২ জন 'মহাজ্ঞানী ব্যক্তি' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে গভর্নরের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে এক নম্বরে নাম ছিল আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের! ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কলিকাতার গড়ের মাঠে যে সভা হয়, তাতে সভাপতিত্ব

www.pathagar.com

করেছিলেন আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এসব বাধার কারণে ১৯১১ সালে ঘোষণা দিলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবটি আঁতুড় ঘরে পড়ে থেকে মৃত্যুর প্রহর গুণছিল। শোনা যায়, অবশেষে নানা বিষয়ে সমঝোতা হয়, যার মধ্যে ছিল মনোগ্রামে 'সোয়াস্তিকা' এবং 'পদ্ম' ফুলের প্রতীক থাকবে। প্রতিবাদকারীরা খুশী হন। অতঃপর ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।" (ডক্টর কাজী জাকের হোসেন ঃ 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমাদের কোন নীতিমালা আছে কি?', দৈনিক ইনকিলাব, ১০ মার্চ,২০০২)।

রবীন্দ্রনাথের লেখায় দেশপ্রেমের কথা থাকলেও, পরাধীনতার বিরুদ্ধে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিনি কখনো সোচ্চার ছিলেন না। তাঁর কবিতায় উপেনদের নিয়ে মর্মস্পর্শী চিত্র আঁকা হলেও এবং সর্বমানবিক প্রেমের কথা থাকলেও পূর্ববঙ্গে শিলাইদহ, শাহজাদপুরে তাঁর বিশাল জমিদারী এলাকায় একটি সামান্য হাসপাতাল, এতিমখানা, প্রাইমারী স্কুল বা এ জাতীয় কোন মানব-কল্যাণমূলক সেবা প্রতিষ্ঠান তিনি প্রতিষ্ঠা করেননি। বরং জমিদার হিসাবে তিনি অন্য জমিদারদের মতোই ছিলেন প্রজা-পীড়ক ও স্বার্থগৃধ্ন। প্রতি বার জমিদারী তদারকীতে এসে তিনি গরীব, কৃষক, মুসলমান রায়তদের নিকট থেকে নজরানা আদায় করতেন। নওগাঁর পতিসরে তাঁর জমিদারীতে তিনি যে একটি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেজন্য তিনি গরীব মুসলমান প্রজাদের উপরে অতিরিক্ত কর ধার্য্য করেছিলেন। এটা তাঁর মহানুভবতা বা অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় বহন করে না।

এক শ্রেণীর লোক তাঁকে 'বিশ্বকবি' বলতে অজ্ঞান, কিন্তু বিশ্বের সর্বশ্রেণীর মানুষ দূরে থাক, বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগণের কথা, সমাজের সাধারণ নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত, দুঃখী মানুষের দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের চিত্রও তাঁর বিশাল সাহিত্যে স্থান লাভ করেনি। মুসলমান জমিদার রেজা খাঁর সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পুরুষদের জমিদারীর দখলী স্বত্ত্ব কায়েম হয়েছিল। বীরভূমের মুসলিম জমিদারের জমিতে কবির স্বপ্নের শান্তিনিকেতন গড়ে উঠলেও বিশাল রবীন্দ্র-সাহিত্যে মুসলমানরা কেবলই সরদার, খানসামা, নৌকার মাঝি, পাইক-বরকন্দাজ জাতীয় তুচ্ছ, হীন চরিত্র ব্যতীত কোন মহৎ, ভদ্র মানবিক চরিত্র হিসাবে স্থান পায়নি। ভারতের সকল অধিবাসীকে 'এক দেহে লীন' হওয়ার কথা বললেও সেটা ছিল মুসলমানসহ সকল অহিন্দুর আপনাপন ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, স্বতন্ত্র পরিচয় ভুলে পৌরাণিক মহাভারতের হিন্দুত্বে বিলীন হয়ে রাম-রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রাবীন্দ্রিক অলীক স্বপ্ন-কল্পনা মাত্র। বহুজাতিক সর্বভারতীয় উদার নৈতিক আধুনিক সমাজের কথা রবীন্দ্রনাথের চিন্তার-দিগন্তে কখনো ছায়া ফেলেনি।

পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু তাঁর 'Discovery of India' গ্রন্থে যেমন লিখেছেন ঃ "Hinduism is the main current of Indian culture,"- রবীন্দ্রনাথও তেমনি ভারতীয় সংস্কৃতির মূলধারা হিসাবে হিন্দুইজমের মহিমা প্রচার ও তাতে অন্য সকল সংস্কৃতি লীন করে দেবার বাসনা থেকেই এ সর্বভারতীয় মহাপরিকল্পনার কথা উচ্চারণ

www.pathagar.com

করেছিলেন। এক্ষেত্রে রাজনীতিক নেহরু আর কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে চিন্তা ও মন-মানসিকতার দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই। রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠে এ রবীন্দ্র-মানসের পরিচয় যে কোন সতর্ক পাঠকের সামনেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তাছাড়া, একথাও ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, উপমহাদেশের মুসলমানগণ ভারতীয় সংস্কৃতির মূলধারা হিন্দুইজমের সাথে কখনো লীন হয়ে যায়নি। পক্ষান্তরে ইসলামের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে এক স্বতন্ত্র জীবনধারা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আলাদা জাতি-সত্তার উদ্ভব ঘটেছে, যার অনিবার্য পরিণতি হিসাবে ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান এবং ১৯৭১ সনে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এ স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও আলাদা জাতি-সত্তা নির্মাণে রবীন্দ্রনাথের কোনই ভূমিকা নেই; বরং রবীন্দ্রনাথের অবস্থান এর সম্পূর্ণ বিপরীত প্রান্তে।

তাই রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের তথা বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্র-মানসের সাথে আমাদের দূরতিক্রম্য ব্যবধান অনস্বীকার্য। এটাকে অস্বীকার করা বাস্তবতাকে অস্বীকার করা, এমনকি, আমাদের স্বতন্ত্র জাতি-সত্তাকে অস্বীকার করারই নামান্তর।

অবশ্য এ ব্যবধান তাঁর অনন্যসাধারণ কবি-প্রতিভাকে স্বীকার বা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে কখনো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনা। কোন কবি বা শিল্পীর সৃষ্টি-কর্মের অপরূপ শিল্প-সৌকুমার্যের তারিফ করা আর তাঁর মানস চৈতন্যের সাথে একাত্ম হওয়া দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। পৃথিবীর বহু কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকের সৃষ্টি-কর্মই আমাদেরকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করে কিন্তু অনিবার্য কারণেই আমরা তাঁদের অনেকের চিন্তা-চেতনা ও মানস-স্বভাবের সাথে একাত্ম হতে পারি না। এরূপ একাত্ম হওয়াটা কখনো জরুরীও নয়।

মহাকবি হোমারের মহাকাব্যে গ্রীক মিথোলজি, জন মিল্টন, টি.এস.এলিয়টের লেখায় খৃস্টান ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাঁদের লেখা পড়ার সময় সে কথা আমাদের মনে কোন প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয় না। তাঁদের লেখার গুণগত মান, শিল্প-সৌন্দর্য ও চিরন্তন মানবিক আবেদন আমাদেরকে আকৃষ্ট করে এবং সে জন্যই তাঁরা আমাদের নিকট বা বিশ্বের নিকট চিরবরেণ্য। তাঁদের সাহিত্যকে বিশ্ববাসী গ্রহণ করেছে, কিন্তু তাঁদের ধর্মকে নয়। তেমনি রবীন্দ্রনাথও আমাদের নিকট তথা বিশ্বের নিকট চিরবরেণ্য, কিন্তু তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত হিন্দুত্ব নয়। বিশ্বের কোন বরেণ্য কবি-সাহিত্যিকের লেখা পাঠ বা তার রসাস্বাদনের জন্য নিজের ধর্ম, সংস্কৃতি বা আদর্শকে বিসর্জন দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও এ বিবেচনা একান্ত সঙ্গত মনে করি। এতে অনেক বিভ্রান্তি ও ভুল-বুঝাবুঝিরই অবসান ঘটতে পারে। কিন্তু যারা রবীন্দ্র-সাহিত্য ও রবীন্দ্র-দর্শনকে একত্রে গুলিয়ে আমাদেরকে গলাধঃকরণ করাতে চান, তারা প্রকারান্তরে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টায়ই লিপ্ত। সাহিত্য পাঠ ও তার মূল্যায়নে এ ধরনের অপপ্রয়াস সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত।

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ
বিশ্বকবি, নোবেল পুরস্কার, জাতীয় কবি প্রসঙ্গ

যে শক্তিমান কবির কাব্য স্বদেশের ও স্বকালের সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন হয়ে ওঠে তখন তাঁকেই 'বিশ্বকবি' হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। এছাড়া, বিশ্বকবি অবশ্যই কালোত্তীর্ণ প্রতিভার অধিকারী। এ অর্থে দান্তে, হোমার, মিল্টন, শেখ সাদী, জামী, ফেরদৌসী, হাফিজ, ওমর খৈয়াম, ইকবাল প্রমুখ বিশ্বখ্যাত, কবিদেরকে বিশ্বকবি বলা যায়। কারণ তাঁদের কাব্যের ভাব ও আবেদন তাঁদের স্বদেশের সীমা অতিক্রম করে ধর্ম-বর্ণ-দেশ নির্বিশেষে বিশ্বজনীন ও চিরকালীন মানুষের অন্তরে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। তাঁদের কাব্য-কলা বা শিল্প-নৈপুণ্যও কালোত্তীর্ণ। কিন্তু তাই বলে তাঁদেরকে আমরা 'বিশ্বকবি' এ বিশেষ অভিধা বা বিশেষণে অভিহিত করি না। তবে বিশ্বকবি হিসাবে তাঁদেরকে অভিহিত না করলেও সারা বিশ্বে চিরকালব্যাপী তাঁরা কবি হিসাবে বিশ্বখ্যাত, বিশ্বনন্দিত ও কালোত্তীর্ণ প্রতিভার দীপ্তিতে চির ভাস্বর। 'বিশ্বকবি' হিসাবে আমাদের নিকট মাত্র একজন কবিই বিশেষভাবে পরিচিত তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরই রবীন্দ্রনাথের নামের সাথে এ অভিধাটি যুক্ত করে দেয় তাঁর ভক্ত-অনুরক্তগণ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভা ও কবি-খ্যাতির দিক দিয়ে নিঃসন্দেহে উপরোক্ত যে কোন কবির সাথে তুলনীয়। অবশ্য প্রত্যেক কবিরই একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ বৈশিষ্ট্যের কারণেই একজন আরেকজন থেকে স্বতন্ত্র। অন্যান্যের মত রবীন্দ্রনাথও তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, অম্লান। তাঁর সৃষ্টি-বৈচিত্র্য ও বিশালত্বও তুলনাবিরল। বাংলা সাহিত্যে তিনি এত অসামান্য অবদান রেখে গেছেন যে, সে জন্য সকলে চিরকাল তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ আশি বছরের জীবনে মোট ৫৬ খানা কাব্যগ্রন্থ, ৪ খানা গীতিকাব্য, ২৯ খানা কাব্যনাট্য ও ২,২৩২টি গান রচনা করেছেন। এছাড়া, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ ১১৯টি ছোটগল্প, ১২টি ভ্রমণ কাহিনী, ৯টি নাটক, বহু সংখ্যক উপন্যাস, বিবিধ বিষয়ে লেখা অসংখ্য প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা ইত্যাদি লিখে বাংলা সাহিত্যে চির অমরত্ব লাভ করেছেন। তাঁর লিখিত অসংখ্য পত্রও সাহিত্য পদবাচ্য। এ জন্য তাঁকে অনেকেই বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। কথাটার মধ্যে খুব একটা অতিশয়োক্তি নেই। রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলা সাহিত্যেই নয়, বিশ্ব

www.pathagar.com

সাহিত্যেও এক অনন্যসাধারণ প্রতিভা। এ জন্য আমরা যথার্থই গর্ব করতে পারি। তবে কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী সম্পর্কে প্রত্যেকেরই একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী, রুচি ও বিবেচনা থাকতে পারে। এ ব্যাপারে প্রত্যেকের যেমন স্বাধীনতা রয়েছে, তেমনি অনর্থক বিতর্ক সৃষ্টি করাও অসঙ্গত।

এখানে ঐসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার করার অবকাশ নেই। শুধু 'বিশ্বকবি' হিসাবে তাঁর উপর আরোপিত বিশেষণটি কতটা যুক্তিযুক্ত এখানে সে প্রসঙ্গেই দু'একটি প্রশ্নের অবতারণা করার প্রয়াস পাব।

বিশ্বকবি

একথা সর্বজনবিদিত যে, রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে পৈত্রিক সূত্রে ব্রাহ্ম হিসাবে পরিচিতি লাভ করলেও পরবর্তীতে নিজেকে তিনি হিন্দু হিসাবে পরিচয় দিতেই গর্ববোধ করতেন। তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্মের আচার-সংস্কারে অতটা বিশ্বাসী না হলেও বেদ-উপনিষদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সনাতন হিন্দুধর্মকে তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন, হিন্দু সমাজ ব্যতীত প্রতিবেশী মুসলিম সমাজ সম্পর্কে তাঁর দু'চোখ বন্ধ রেখেছেন। বরং তিনি তাঁর কাব্যে উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা এবং চরম মুসলিম-বিদ্বেষ প্রচার করেছেন। এহেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ভাব ও আবেদন কতটা বিশ্বজনীন ও সর্বজনগাহ্য হতে পারে সে প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই উঠতে পারে। অন্য ধর্ম, কৃষ্টি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সভ্যতার প্রতি এতটুকু শ্রদ্ধাবোধ পোষণ না করে যিনি "এক ধর্ম রাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি" বলে দৃঢ় চিত্তে "এক ধর্ম রাজ্য হবে এ ভারতে' এ মহাবচন করিব সম্বল" করে যিনি কাব্য সাধনা করেছেন, 'যবন নিধন' ও 'এক ধর্মরাজ্যে'র নামে যিনি সমগ্র ভারতে অখণ্ড রামরাজত্ব কায়েমের স্বপ্ন দেখেছেন, তিনি হিন্দুর নিকট 'কবিগুরু' আখ্যা পেলেও এবং ভারতের জাতীয় কবির মর্যাদা পেলেও মুসলমান ও স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষের নিকট তাঁর গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু ? হিন্দু ব্যতীত তাঁর উপনিষদের দর্শন ও রামরাজত্বের কল্পনা মুসলমান বা অন্য ধর্মাবলম্বীদের নিকট কতটুকু আবেদন সৃষ্টি করতে পারে ? অর্থাৎ বিশ্বকবি হওয়ার জন্য সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রতি সমদৃষ্টি ও মমত্ববোধ থাকা 'বিশ্বকবি' অভিধা প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য এক অপরিহার্য শর্ত'।

দ্বিতীয়তঃ রবীন্দ্রনাথ যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন পুরুষানুক্রমে সে পরিবার শাসকগোষ্ঠীর অনুগত থেকে সর্বদা রাজানুগ্রহ লাভ করে এসেছে। ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে কলকাতার জে. এন. ঘোষ রচিত 'The modren History of the Indian Chiefs, Rajas and Zaminders' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, বঙ্গরাজ আদিশূরের আমন্ত্রণে দাক্ষিণাত্যের কণৌজ থেকে যে পাঁচ জন কুলীন ব্রাহ্মণ ১০৭২ খৃস্টাব্দে বাংলাদেশে এসে স্থায়ী নিবাস স্থাপন করেছিলেন, ভট্টনারায়ণ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। তিনি সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং কাশীময়ণ, মুক্তি বিচার, প্রয়াগরত্ন, বেনীসংহার নামক সংস্কৃত নাটকের রচয়িতা। ভট্টনারায়ণের এক অধঃস্তন পুরুষ ধনঞ্জয় রাজা বল্লাল সেনের

www.pathagar.com

আমলে একজন বিচারক ছিলেন। তিনি নির্ঘট নামে বৈদিক শব্দের একটি সংকলন প্রস্তুত করেন। ধনঞ্জয়ের পুত্র হলায়ুধ রাজা লক্ষণ সেনের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনিও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ব্রাহ্মণসর্বস্ব, মাৎস্যশুক্র তন্ত্র অভিধান রত্নমালা, কবি রহস্য প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। হলায়ুধের এক অধঃস্তন পুরুষ পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ হিন্দু আইন, ধর্মীয় আচার, কাব্য বিচার প্রভৃতি বিষয়ে আটখানা গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর এ পাণ্ডিত্যের কারণে তিনি তৎকালীন মুসলিম রাজপুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং রাজানুগ্রহ লাভ করেন। একদিন বিদ্যাবাগীশ তাঁর এক বন্ধু পীর আলী খান নামক জনৈক মুসলিম রাজকর্মচারীর (আমিন) বাসায় বেড়াতে যান। তখন সেখানে গরুর গোশত রান্না হচ্ছিল। বাবুর্চিখানা থেকে সে রান্নার খুশবু তাঁর নাসিকা-রন্ধ্রে প্রবেশ করে। ঘটনাটি জানাজানি হয়ে গেলে তিনি লজ্জিত হন। কারণ শাস্ত্রমতে 'ঘ্রাণং অর্ধভোজনং'। এ কারণে পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশের জাত যায় এবং তিনি নিজ সমাজে পীরালি (পীর আলী) ব্রাহ্মণ নামে উপহসিত হন। ফলে লোকলজ্জায় তিনি গৌড় ত্যাগ করে যশোরে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। গৌড়ের মুসলিম সুলতান যশোরে তাঁকে জায়গীর ও প্রচুর লাখেরাজ সম্পত্তি মঞ্জুর করেন।

পলাশী যুদ্ধের পর কলকাতায় নতুন রাজধানী স্থাপিত হলে পুরুষোত্তমের এক অধঃস্তন পুরুষ পঞ্চানন কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের নিকটবর্তী গোবিন্দপুরে বসতি স্থাপন করেন। সেখানে ইংরেজ রাজ-কর্মচারীদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং তিনি নিজেও ইংরেজ সরকারের চাকুরীতে যোগ দেন। পঞ্চাননের পুত্র দর্পনারায়ণ ইংরেজী, ফরাসী ও সংস্কৃত ভাষায় দক্ষ ছিলেন এবং তিনি ফরাসী সরকারের চাকুরী ছাড়াও ব্যবসা করে প্রচুর বিত্ত-বৈভব অর্জন করেন এবং তা দিয়ে রংপুরে জমিদারী ক্রয় করেন। দর্পনারায়ণের পুত্র গোপীমোহন জমিদারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। ১৮১৫ খৃস্টাব্দে কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় তিনি মোটা অঙ্কের টাকা দেন। ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর আরো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গোপীমোহনের তিন পুত্র মহারাজা জ্যোতিন্দ্র মোহন সি.এস.আই রাজা সৌরিন্দমোহন ঠাকুর সি.আই.ই এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর সি.এস.আই নামে পরিচিত ছিলেন। ঠাকুর পরিবারের পরবর্তী এক পুরুষ দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বয়ং ইংলান্ডের রাণী কর্তৃক 'প্রিন্স' খেতাব প্রাপ্ত হন। দ্বারকানাথের তিন পুত্র দেবেন্দ্রনাথ, গিরিন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাঁচ পুত্র–তন্মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বহু সংখ্যক নাটক রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন এবং রবীন্দ্রনাথ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও প্রধানতঃ কবি হিসাবে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন এবং বাংলা সাহিত্যে প্রথম এবং এ যাবত পর্যন্ত একমাত্র নোবেল বিজয়ীর অনন্য সম্মান লাভ করেন।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে জানা গেল, বংশানুক্রমিকভাবে রবীন্দ্র-পরিবার হিন্দু সেন আমল, মুসলিম আমল এবং ইংরেজ আমল–সকল যুগেই রাজানুগত ছিলেন এবং

www.pathagar.com

সর্বদা রাজানুগ্রহ ভোগ করে এসেছেন। জমিদার ও ব্যবসায়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সর্বদা রাজানুগত ছিলেন। স্বাধীনতার সপক্ষে বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনে উপমহাদেশের আপামর জনসাধারণ যখন সোচ্চার, রবীন্দ্রনাথ তখনো ইংরেজ রাজ-শক্তির প্রশস্তি গেয়ে গান-কবিতা রচনা করেছেন, ইংরেজদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থেকেছেন, পরাধীনতার জিঞ্জির মুক্তির কর্মসূচীকে নানা যুক্তির অবতারণা করে প্রত্যাখ্যান করেছেন, সে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে জাতীয় আশা-আকাংক্ষার প্রতিফলন প্রত্যাশা করা নিতান্ত অবান্তর। তাই সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, যিনি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অনুগত হিসাবে কাজ করেন এবং স্বাধীনতাকামী উপমহাদেশের জনগণের আশা-আকাংক্ষা-স্বপ্নের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করেন তিনি 'বিশ্বকবি'র অভিধায় কতটা মানানসই? এ প্রসঙ্গে ডক্টর এবনে গোলাম সামাদের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ

"রবীন্দ্রনাথের যে উপন্যাসটি ইংরেজ আমলে সবচেয়ে বেশী বিক্রি হয়েছিল, তার নাম 'চার অধ্যায়'। ইংরেজ সরকার এই উপন্যাস কিনে জেলে স্বদেশী আন্দোলনের জন্য আটকে রাখা বন্দীদের পড়তে দিত। এতে রবীন্দ্রনাথ সে সময়ের সশস্ত্র বিপ্লবীদের জীবনকে অত্যন্ত খাটো করে এঁকেছেন। রবীন্দ্রনাথের বৃটীশ-বিরোধী আন্দোলনে কোন ভূমিকা ছিল না। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' বইটি যখন বেআইনী হয়, তখন তিনি কোন মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন। তিন জন কবি ইংরেজ আমলে বৃটীশ-বিরোধী কবিতা লিখে জেল খেটেছেন ঃ হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, ইসমাইল হোসেন সিরাজি এবং কাজী নজরুল ইসলাম। অবশ্য বলছি না, জেল খাটলেই লোকে দেশপ্রেমিক হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতাঞ্জলীতে ইংরেজকেও বলেছেন মার অভিষেকে সূচিকার মত সবার হাত ধরতে। উপনিষদের ভিত্তিতে এক ভারতীয় মহাজাতি গড়ে তুলতে। কবি সত্যেনদত্ত অনেক কবিতা লিখেছেন, যাতে বাঙালী জাতীয়তাবাদ উৎসাহ পায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এমন কোন কবিতা নেই।" (ডক্টর এবনে গোলাম সামাদ ঃ বাংলাদেশের রাজনীতিতে বাম, ডান এবং নব্য রাজাকার, দৈনিক ইনকিলাব, ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯)।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত হবার পর এ ব্যাপারে তিনি রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতা চেয়ে পত্র লেখেন। শরৎচন্দ্র হয়ত আশা করেছিলেন যে, ইংরেজ সরকারের সাথে রবীন্দ্রনাথের যে প্রীতিপ্রদ সম্পর্ক তার সুবাদে সরকারের বাজেয়াপ্তি আদেশ রদ করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের চিঠির জবাবে রবীন্দ্রনাথ যা লেখেন তা শুধু শরৎচন্দ্রকেই নয় বহু সুবিবেচক দেশপ্রেমিক ব্যক্তিকেই ব্যথিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ এর জবাবে যা লিখেছিলেন এবং তা পড়ে শরৎচন্দ্রের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল তা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের এ পত্রে ইংরেজ প্রভুদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম আনুগত্যের ভাব ফুটে উঠলেও দেশ-প্রেমিকদের জন্য তা ছিল চরম হতাশাব্যঞ্জক। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজ-প্রীতির আরো একটি নমুনা দেয়া যাক। কলকাতায় এক সময় কুলি-মজুর-গাড়োয়ান

www.pathagar.com

শ্রেণীর দরিদ্র, ভাগ্যাহত মুসলমানগণ সাহেব ইংরেজদের অত্যাচার ও বুটের লাথির আঘাতে অতিষ্ঠ হয়ে যখন তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল "মার! মার! করে ইট পাথর ছুড়ে মারতে লাগলো ইংরেজদের উপর তখন ইংরেজদের 'দেশীয় দালাল'রা তা সমর্থন করেননি, বরং তার বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে ইচ্ছামত লিখে গেছেন এবং তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন এমন নজিরও আছে।"(দ্র. গোলাম আহমাদ মোর্তজা ঃ চেপে রাখা ইতিহাস, পঞ্চম সংস্করণ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৯৯৬, পৃ ২৯০)।

ঐ ঘটনা সম্পর্কে শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিক্রিয়া তাঁর 'রাজা প্রজা' প্রবন্ধে ব্যক্ত হয়েছে। তার অংশবিশেষ নীচে উদ্ধৃত হলো ঃ "কিছুদিন হইল একদল ইতর শ্রেণীর অবিবেচক মুসলমান কলিকাতার রাজপথে লোষ্ট্র খণ্ড হস্তে উপদ্রবের চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার মধ্যে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, লক্ষ্যটা বিশেষরূপে ইংরেজদের প্রতি। তাহাদের যথেষ্ট শাস্তিও হইয়াছিল।... কেহ বলিল মুসলমানদের বস্তিগুলি একেবারে উড়াইয়া পুড়াইয়া দেওয়া যাক...।" (রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃ.৪২৮-২৯)।

এখানে রবীন্দ্রনাথের অকপট ইংরেজ-প্রীতিই শুধু নয়, ইংরেজরা শাসক শ্রেণী, প্রভুর জাত আর মুসলমানরা দরিদ্র ও ইংরেজের প্রজা। অতএব তারা ইতর শ্রেণীর লোক, তাদেরকে নিশ্চিহ্ন-বিলীন করে হলেও প্রভু ইংরেজের শাসন ও জাত রক্ষা করতে হবে। এই হলো 'উদার মানবতাবাদী' রবীন্দ্রনাথের চরম অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গী, যার মাধ্যমে তাঁর নির্দ্বন্দ্ব ইংরাজ-তোষণ নীতির পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অতএব সঙ্গতভাবেই এ প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে যে, যিনি জাতীয় স্বাধীনতা, জাতীয় ভাবধারা ও আশা-আকাংক্ষার বিরোধী, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের ধ্বজাধারী এমনকি, চরম অমানবিক চিন্তা-চেতনার ধারক-পোষক তিনি 'বিশ্বকবি'র শিরোপা লাভের অধিকারী হতে পারেন কীভাবে ? বিশ্বজনীন আবেদন সৃষ্টির জন্য জাতীয় আশা-আকাংক্ষা ও স্বসমাজ-মানসের প্রতিনিধিত্ব করা, সর্বোপরি, মানবতার মহত্ত্বকে উচ্চে তুলে ধরা এক অপরিহার্য শর্ত।

তৃতীয়তঃ রবীন্দ্রনাথ একটি পরাধীন, অনুন্নত গরীব দেশে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও তাঁর সাহিত্যে দরিদ্র, বুভুক্ষু, নির্যাতীত, নিপীড়িত, কুলি-মজুর-কৃষক ও সর্বহারা মানুষের দুঃখময়, দুঃসহ ও বঞ্চনাপূর্ণ জীবনের প্রতিফলন ঘটেনি। তাঁর সাহিত্যে উচ্চবিত্ত এবং বড় জোর মধ্যবিত্ত জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি সর্বদা বুর্জোয়া, ধনিক-বণিক-জমিদার ও শাসক শ্রেণীর স্বার্থকে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। ইংরেজ শাসকদের আশীর্বাদপুষ্ট জমিদার রবীন্দ্রনাথ চিরকাল শিক্ষিত উচ্চ ও মধবিত্ত হিন্দু সমাজের প্রতিনিধিত্ব করাতেই সন্তোষ ও স্বস্তিবোধ করেছেন। এহেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের আবেদন যে কোনমতেই সর্বজনীন, সর্ববিস্তারী, সর্বজনগ্রাহ্য ও বিশ্বজনীন হতে পারেনা তা সহজেই অনুমেয়। তাহলে বিশ্বকবি অভিধা তাঁর জন্য কতটা উপযোগী ?

www.pathagar.com

তবু 'সোনার পাথরবাটির মত অবাস্তব প্রবচনে বিশ্বাসী এক শ্রেণীর অন্ধ রবীন্দ্রানুসারী তাঁকে 'বিশ্বকবি' বলতে অজ্ঞান! অতি প্রশস্তি ও অন্ধ ভক্তিতে রবীন্দ্রনাথকে তারা আরো কত বিশেষণে যে আখ্যায়িত করে থাকেন, এমন কি অন্ধ আবেগে অন্যদেরকে অহেতুক তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে হলেও রবীন্দ্রনাথকে আকাশচুম্বী করে তুলে ধরার প্রাণান্তকর প্রয়াসে লিপ্ত হয়ে তারা অফুরন্ত আনন্দে আত্মহারা হতে চান। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সাহিত্য বিচারে অন্ধভক্তি ও আবেগসর্বস্বতার কোন দাম নেই। সাহিত্য-বিচারের একটি কালনিরপেক্ষ, যুক্তিনির্ভর, সনাতন পদ্ধতি বিদ্যমান। সে বিচারে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে এক বিরল প্রতিভার অধিকারী বিশ্বখ্যাত চির অমর কবি হিসাবে অবলীলায় স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। কিন্তু ঐ 'বিশ্বকবি'র আরোপিত অভিধাটুকু কতটুকু তাঁর ব্যাপারে মানানসই সে প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই উঠতে পারে। মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর কোন বড় কবি বা শিল্পীই সমালোচনার উর্ধে নয়, রবীন্দ্রনাথকে যারা এর ব্যতিক্রম মনে করেন, তাদের রবীন্দ্র-ভক্তি প্রশ্নাতীত হলেও তাদের কান্ডজ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে স্বভাবতই প্রশ্ন তোলা যায়।

একজন বিশিষ্ট ভারতীয় লেখকের মন্তব্য দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করছিঃ "ছোট কি মেজো-সেজোদের কথা ছেড়ে দিয়ে বাংলা এমনকি আধুনিক ভারতের যিনি নিঃসন্দেহে সব চাইতে বড় লেখক সেই রবীন্দ্রনাথের কথাই যদি ধরা যায় তাহলেও বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্থান কত উঁচুতে সে বিষয়ে কিছু সংশয়ের অবকাশ থাকে। নাট্যকার হিসাবে তিনি কি ইউরিপিদিস, শেক্সপীয়র, মলিএর, ইবসেন অথবা ও'নীলের সমতুল্য? ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁকে কি স্তাঁদাল, ডস্টয়েভস্কী, টলস্টয়, টমাস মান অথবা প্রুস্ত-এর কোঠায় ফেলা চলে? এমনকি, এত যে তাঁর কবি-খ্যাতি তা সত্ত্বেও একথা কি আমরা বলতে পারি যে র‍্যাঁবো, রিলকে বা ইয়েটস জীবনের যেসব অতলস্পর্শ অভিজ্ঞতাকে তাঁদের সার্থকতম কবিতার মধ্যে ধরতে পেরেছিলেন রবিঠাকুরের কবিতায় তাদের সন্ধান মেলে? তিনি কত গান বেঁধেছিলেন পৃথিবীতে কেউ বোধ হয় কখনও একা অত গান বাঁধেননি। তাঁর সে গানে আমরা মুগ্ধ। তবু মুখ্যত সুরের দিক থেকে বিচার করলে কি এদেশের কি পশ্চিমের শ্রেষ্ঠ সুরকারদের রচনার সঙ্গে তাঁর কি সত্যিই কোন তুলনা সম্ভব? আমি যতটুকু বুঝি তাতে মনে হয় এক ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তিনি নিঃসন্দেহে বিশ্বের প্রধানদের অন্যতম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি আখ্যা দিয়ে এদেশে যারা তাঁর গরবে গরবী, বিশ্বভূমিকায় তাঁর এ ধরনের মূল্যায়নের সম্ভাবনায় তাঁদের মন উঠবে ভরসা হয় না।" (শিবনারায়ণ/রবীন্দ্রনাথ ও গোয়েটে ঃ কবির নির্বাসন ও অন্যান্য ভাবনা, পৃ. ৯২-৯৩)।

রবীন্দ্র-চর্চার নামে যারা রবীন্দ্র-পূজা করে থাকেন, উপরোক্ত মন্তব্য তাদের বিবেককে কিছুটা হলেও নাড়া দেবে বলে আশা করি। 'বিশ্বকবি' অভিধা সম্পর্কেও তারা নতুনভাবে চিন্তা-ভাবনা করবেন বলে আশা করা যায়।

www.pathagar.com

নোবেল পুরস্কার

'নোবেল পুরস্কার' সম্পর্কেও সামান্য প্রশ্নবোধক চিহ্নের অবতারণা করার অবকাশ বিদ্যমান। নোবেল পুরস্কার সারা বিশ্বে সর্বাধিক সম্মানজনক ও বিপুল অঙ্কের পুরস্কার। তবে এ পুরস্কার কতটা রাজনীতিমুক্ত ও সর্বদা নিরপেক্ষভাবে প্রদান করা হয় কিনা, তা নিঃসংশয়ে বলা সম্ভব নয়। সারা বিশ্বের বাছাইকৃত সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তিরাই শুধু এ পুরস্কার পেয়ে থাকেন তাও সর্বদা সঠিক নয়। পুরস্কারদাতাদের ইচ্ছা, রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গী এর পেছনে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথসহ অন্ততঃ ডজন খানেক কবি-সাহিত্যিক এ পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য হলেও একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অন্য কোন বাঙালি কবি-সাহিত্যিককে এযাবত কাল এ মহামূল্য পুরস্কারের জন্য বিবেচনায় আনা হয়নি। ররীন্দ্রনাথ অবশ্যই এ পুরস্কার লাভের জন্য একজন অতি যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু শুধু সে যোগ্যতার বলেই কি তাঁকে পুরস্কার দেয়া হয়? পুরস্কারের পেছনে যে রাজনৈতিক বুদ্ধি ও সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তা এমন হুবহু মিলে যায় যে, অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও অনেকের মনে তা স্বভাবতই প্রশ্নের উদ্রেক করে থাকে।

বংশানুক্রমিকভাবে রবীন্দ্রনাথ এমন এক পরিবারের সদস্য যে পরিবারটি সহস্রাধিক বছর ধরে বাংলায় হিন্দু-মুসলিম-ইংরেজ পর্যায়ক্রমে সকল রাজশক্তির সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে সকলেরই পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এসেছে এবং ধীরে ধীরে প্রচুর বিত্ত-বৈভব, জমিদারী ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের দাদা দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংরেজ-সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক ১৮৪২ খৃস্টাব্দের ১৬ জুন 'প্রিন্স' খেতাবে ভূষিত হন। দ্বারাকানাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমানাথ ঠাকুরও 'মহারাজ' খেতাব পান। রবীন্দ্রনাথ নিজেও 'নাইট' উপাধি লাভ করেন। ইংরেজদের সাথে সখ্যতা তো ছিলোই, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কোন বক্তব্য বা কর্মকান্ডে রবীন্দ্রনাথ কখনো জড়িত ছিলেন না। এহেন একজন রাজানুগত বিখ্যাত জমিদার ও প্রভাবশালী বড় কবির পক্ষে নোবেল পুরস্কার পাওয়া কোন বিচিত্র ব্যাপার নয়।

এ প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন। প্রশাসনিক সুবিধার্থে এবং পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত পূর্ববঙ্গ ও আসামের উন্নতিকল্পে প্রধানতঃ মুসলমানদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯০৫ সনে বঙ্গ বিভক্ত হয়ে ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ গঠিত হয়। ফলে মুসলিম-প্রধান নতুন প্রদেশের উন্নতি-অগ্রগতির নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এতে নতুন প্রদেশের সকল জনসাধারণ তথা হিন্দুদেরও উন্নতি-অগ্রগতির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকা নিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হলে ভারতের পূর্বাঞ্চলে একটি বৃহৎ ভূভাগে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে, এটা কোন হিন্দুরই অভিপ্রেত ছিল না। ফলে পূর্ববঙ্গ ও আসাম এমনকি, নতুন রাজধানী ঢাকার হিন্দুসহ সর্বভারতীয় হিন্দু নেতৃস্থানীয়

www.pathagar.com

ব্যক্তিগণ বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন ও এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেইসব নেতাদের অন্যতম। কলকাতায় তারা বঙ্গভঙ্গ রদের দাবীতে যে সভা করেন তাতে সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এ সময় তিনি অবিভক্ত বাংলার পক্ষে গানও রচনা করেন। গানের কয়েকটি লাইন নিম্নরূপঃ

"বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পূণ্য হউক, হে ভগবান।
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক এক হউক হে ভগবান।"

এভাবে বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে যুক্ত বাংলার পক্ষে তিনি গান-কবিতা রচনা করেন। অবশেষে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ ও প্রভাবশালী হিন্দুদের আন্দোলন ও দাবীর ফলে ইংল্যান্ডের রাজা ১৯১১ খৃস্টাব্দে ভারত সফরে এলে দিল্লীতে সর্বভারতীয় হিন্দু নেতৃবৃন্দ তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা প্রদানের ব্যবস্থা করে। সে সভার শুরু হয় রবীন্দ্রনাথ রচিত উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে। ইংরেজ-সম্রাটের উদ্দেশ্যে নিবেদিত সে গানের কয়েকটি চরণঃ

"জনগণমন অধিনায়ক জয় হে
ভারত ভাগ্য-বিধাতা
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্যা হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছল জলধি তরঙ্গ।"

এ গানে ইংল্যান্ডের রাজার বন্দনা ও প্রশস্তি রয়েছে, ভারতের 'ভাগ্য-বিধাতা' বলে তাঁর প্রতি গভীর আনুগত্য প্রদর্শন করা হয়েছে, ভারতের অখন্ডত্বের কথাও বলা হয়েছে, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার কোন কথা সেখানে নেই। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, এ গানটিই পরে স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয়। যাইহোক, ঐরূপ প্রশস্তিমূলক এবং পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শনমূলক গান গেয়ে বক্তারা এক এক করে সকলেই সম্রাটের নিকট বঙ্গভঙ্গ রদ করার আবদার জানায়। ফলে তাদের আনুগত্যে অভিভূত সম্রাট দিল্লীর দরবার অনুষ্ঠানে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দিয়ে অনুন্নত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ ও আসামের বিশাল জনপদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার অবলীলায় জলাঞ্জলী দিয়ে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনমন্ডলীকে খুশী করলেন আর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরেও তাঁর

www.pathagar.com

প্রশস্তিসূচক রবীন্দ্রসঙ্গীতের গীতিময় সুর-মূর্চ্ছনা তাঁর কর্ণ-কুহরে অনুভব করতে থাকেন।

রবীন্দ্রনাথ 'সোনার বাংলা' গান লিখেছিলেন বঙ্গভঙ্গ রদ করার উদ্দেশ্যে। দিল্লীর রাজ-সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সম্রাট পঞ্চম জর্জকে খুশী করার জন্য যে গান লিখেছিলেন সেটাও তাঁকে খুশী করে তাঁকে দিয়ে বঙ্গভঙ্গ রদ করারই উদ্দেশ্যে। বঙ্গভঙ্গের ফলে 'বঙ্গ-মাতা'কে দ্বিখন্ডিত এবং বঙ্গসংস্কৃতির ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছে বলে হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য যে আন্দোলন পরিচালনা করে রবীন্দ্রনাথ তার অন্যতম শীর্ষ নেতা ছিলেন। কলকাতায় বঙ্গভঙ্গ রদের দাবিতে হিন্দুরা যে সভা করেছিল রবীন্দ্রনাথ তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন। কিন্তু এ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আরো যে সব প্রেরণা ও স্বার্থবুদ্ধি কাজ করেছিল সে সম্পর্কে উপমহাদেশের প্রখ্যাত বাম আন্দোলনের নেতা কমরেড মুজাফফর আহমদের একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেনঃ

"পূর্ববঙ্গের বড় বড় হিন্দু জমিদাররা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। আন্দোলন জোরদার হওয়ার এটাও একটা কারণ ছিল। জমিদাররা ভয় পেয়েছিলেন যে, মুসলিম কৃষক প্রজাপ্রধান পূর্ববঙ্গে না জমিদারী প্রথা বিলোপ হয়ে যায়।" (মুজাফফর আহমদঃ আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, ঢাকা সংস্করণ, ১৯৭৭, পৃ ৭)।

উপরোক্ত মন্তব্য সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে ডক্টর এবনে গোলাম সামাদ বলেনঃ "অন্য জায়গার কথা জানি না। নওগাঁ জেলার কালীগ্রাম পরগণায় ছিল রবীন্দ্রনাথের বিরাট জমিদারী। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই সেটা হারানোর ভয় পেয়েছিলেন। মুজাফফর আহমদ একেবারে বাজে কথা লিখেছেন বলে ভাববার কারণ নেই। এই সোনার বাংলা গানের মূলে লুকিয়ে ছিল অত্যাচারী রবীন্দ্রনাথের জমিদারী রক্ষার বিশেষ অভিপ্রায়। এই জমিদারী রবীন্দ্রনাথকে যুগিয়েছে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ানোর খরচ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কালীগ্রাম পরগণার সদর কাচারী পতিসরে কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেছিলেন। তিনি কলিকাতার ব্যাংক থেকে ৮ টাকা সূদে টাকা ধার নিয়ে পতিসরে কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে তা কৃষকদের ধার দিতেন ১২ টাকা সূদে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নোবেল পুরস্কারের ১,০৮,০০০ টাকা এই কৃষি ব্যাংকে জমা রাখেন শান্তিনিকেতনের নামে। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় এবং পরে বিশ্বভারতী এই ব্যাংক থেকে সূদ হিসাবে প্রতি বছর পেত ৮ হাজার টাকা। সে সময় ৮ হাজার টাকা ছিল যথেষ্ট টাকা। রবীন্দ্রনাথ পতিসরে যে হাইস্কুল করেন, তার জন্য তিনি কৃষক প্রতি টাকায় তিন পয়সা করে বাড়তি কর বসান। রবীন্দ্রনাথ পরে এই কৃষি ব্যাংক তুলে দিতে বাধ্য হন। কারণ আইন হয়, কৃষকের কাছ থেকে কৃষিঋণ প্রদান করে এত চড়া হারে সূদ গ্রহণ চলবে না বলে। রবীন্দ্রনাথ এক একবার জমিদারীতে এসে প্রচুর নজরানা গ্রহণ করতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই দিকটি নিয়ে আলোচনা হয়নি আজও। রবীন্দ্রনাথের গফুর

www.pathagar.com

নামে একজন মুসলমান বাবুর্চি ছিল। তার রান্না মাংস সহ রবীন্দ্রনাথ প্রচুর বিলাতী মদিরা পান করেছেন পতিসরে বসে, এ রকমই শোনা যায়। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন বিলাসী পান-ভোজনে অভ্যস্থ বিরাট জমিদার ।" (পূর্বোক্ত)।

রবীন্দ্রনাথের শুধু পতিসরেই নয়, শাহজাদপুর, কুষ্টিয়ার শিলাইদহে বিরাট জমিদারী ছিল। এসব জমিদারী দেখাশোনার জন্য তাঁকে এসব জায়গাতে আসতে হতো। এসব জায়গাতে বসে তিনি প্রচুর লেখালেখিও করেছেন। তাঁর প্রজারা ছিল অধিকাংশই গরীব মুসলমান। জমিদারী থেকে যে বিশাল অংকের আয় হতো তা সবই তাঁর উচ্চ জীবনযাপনে খরচ হতো এবং জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে স্থানান্তরিত হতো। পতিসরে তিনি একটি হাই স্কুল করলেও শাহজাদপুর বা শিলাইদহে প্রজা-সাধারণের উন্নতির জন্য তিনি একটি প্রাইমারী বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন নি, হাসপাতাল স্থাপন বা সমাজকল্যাণমূলক কোন কাজও করেন নি। এ সম্পর্কে জনৈক লেখকের একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করছিঃ

"পূর্ববঙ্গের হতদরিদ্র মুসলমানদের শিক্ষার আলো থেকে দূরে রাখার জন্য শিলাইদহে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়নি বরং শিলাইদহ জমিদারীর আয়ে রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমবঙ্গের বোলপুরে শান্তিনিকেতনে এক বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। এমনকি, ইংরেজ সরকার যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয় তখন রবীন্দ্রনাথ সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন তীব্রভাবে।" (খালিদ মোহাম্মদঃ রবীন্দ্রনাথের আদর্শ এবং আনন্দবাজারী আগ্রাসন প্রসঙ্গে)।

বঙ্গভঙ্গের ফলে এ অঞ্চলের পশ্চাৎপদ জনগণের উন্নয়নের সম্ভাবনা দেখা দিলে এবং কালক্রমে দরিদ্র মুসলমান জনসাধারণ জেগে উঠলে তাঁর এবং তাঁর মত জমিদার, জোতদার, ব্যবসায়ী তথা কায়েমী স্বার্থের ধ্বজধারীদের এবং কলকাতার বিশেষ সুবিধাভোগী বাবু সম্প্রদায়ের সমূহ স্বার্থহানি ঘটতে পারে এ আশংকায় তারা বঙ্গভঙ্গ রদের আন্দোলনে উঠে পড়ে লাগে।

কলকাতার শহুরে পরিবেশে থেকে পতিসর, শিলাইদহ, শাহজাদপুরের উন্মুক্ত সবুজ প্রকৃতি ও নদীনালার সৌন্দর্যময় পরিবেশে এসে তিনি নতুন প্রাণ-চাঞ্চল্য অনুভব করেছেন। এখানকার সরল-সহজ-দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের সংস্পর্শে এসে, পদ্মা নদী, ইছামতি নদীর বুকে মনের আনন্দে অফুরন্ত নৌবিহার করে তাঁর অনেক শ্রেষ্ঠ লেখার অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। 'সোনার তরী,' 'চিত্রা', 'চৈতালী'র অধিকাংশ কবিতা, 'পোষ্টমাস্টার'সহ গল্পগুচ্ছের বহু গল্প, 'বিসর্জন' নাটক ইত্যাদি তিনি তাঁর শিলাইদহ, শাহজাদপুরের জমিদারী এলাকায় বসে রচনা করেছেন। এসব এলাকা তাঁর কত ভাল লাগতো তা তাঁর লেখাতেও তিনি উল্লেখ করেছেনঃ

"অনেক কাল বোটের মধ্যে বাস করে হঠাৎ সাজাদপুরে এসে উত্তীর্ণ হলে বড় ভাল লাগে।" (সাজাদপুর, ৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪। ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ১৪৯)।

www.pathagar.com

এখানে চোখে পড়ার মত যে, শাহজাদপুরে তাঁর কাছাড়ী বাড়ি তাঁর এত প্রিয় হলেও 'শাহজাদপুর' বানানটি তিনি সর্বদা তাচ্ছিল্য ভরে 'সাজাদপুর' লিখেছেন। 'ছিন্নপত্র' থেকে আর একটি উদ্ধৃতি দেই ঃ

"আমার এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারী মায়া করে–এরা যেন বিধাতার শিশু সন্তানের মতো নিরূপায়–তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই।"(শিলাইদহ, ১০ মে, ১৮৯৩। ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ৯৫)।

লক্ষ্য করার বিষয় যে, কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর দারিদ্র্যপীড়িত অসহায় কৃষককুলের দুঃসহ জীবন সম্পর্কে সহানুভূতিপূর্ণ আপ্তবাক্য উচ্চারণ করলেও জমিদার রবীন্দ্রনাথ তাঁর দরিদ্র প্রজাদের জীবনধারণের জন্য শুধু বিধাতার করুণাদৃষ্টির কথাই বলেছেন, দরিদ্র প্রজাদের ভাগ্যোন্নয়নের ক্ষেত্রে জমিদারের বিন্দুমাত্র দয়িত্ববোধের কথা বলেননি। কোন কিছু করেছেন বলেও জানা যায় না। কবিতার ভাষায় মানবপ্রেমের বাণী প্রচার করলেও বাস্তবে হত-দরিদ্র মানুষের দুর্দশা লাঘবে তাঁর কোন তৎপরতাই ছিল না।

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির বহু পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ ইংল্যান্ড এবং পাশ্চাত্যের বহুদেশ পরিভ্রমণ করে পাশ্চাত্যের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও জীবনধারা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লেখালেখি ও বক্তৃতা করেন। পুরস্কার প্রাপ্তির দু' বছর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তৃতীয় বারের মত ইংল্যান্ড সফরে যান। প্রখ্যাত ইংরেজ কবি ডবলিউ. বি. ইয়েটস-এর সঙ্গে তখন তাঁর ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়। ইয়েটস সে সময় তাঁকে ইংলান্ডের বহু কবি-সাহিত্যিক-দার্শনিক ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তির সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। সে সুবাদে ইংল্যান্ডের প্রভাবশালী পত্রিকা 'দি ইনডিপেনডেন্ট,' 'ফাইনানসিয়াল টাইমস', 'দি ডেইলী টেলিগ্রাফ' প্রভৃতি পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বেশ লেখালেখি হয়। ইংরেজ কবি রবার্ট ফ্রস্ট লেখেন ঃ "Its fine to hear he's (Tagore) still a living force in India"

এজরা পাউন্ড, পার্ল এস. বাক প্রমুখ বিখ্যাত কবি-সাহিত্যকগণও সে সময় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত ভাষায় লেখালেখি করেন। ইয়েটস তো রবীন্দ্রনাথকে পাশ্চাত্যের জ্ঞানী-গুণীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হননি, তিনি রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলীর ইংরেজী অনুবাদ দেখে দেন এবং তাতে নিজের লেখা দীর্ঘ ভূমিকা যোগ করে দেন, নোবেল পুরস্কারের জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথের নাম প্রস্তাব করেন এবং এ জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট মহলে যথেষ্ট লবিং করেন। ফলে রবীন্দ্রনাথের জন্য পুরস্কার পাওয়া অনেকটা সহজ হয়। অন্য কোন বাঙালি কবি-সাহিত্যিকের এ ধরনের কোন ব্যাকিং ছিল না, ফলে প্রতিভা ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অন্যদের ভাগ্যে এ পুরস্কার জোটেনি বা সংশ্লিষ্ট মহলে এ যাবত অন্য কোন বাঙালি লেখকের নামও কেউ প্রস্তাব করেনি। পারিবারিক ঐতিহ্য ও ইংরেজদের সাথে সখ্যতা নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে সহায়ক হয়েছে। তবে সেটাই শেষ কথা নয়, আংশিক সত্য বটে।

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন অবশ্যই তাঁর যোগ্যতার বলে এর দ্বারা বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি জাতি অবশ্যই গৌরববোধ করেছে। তবে শুধু যোগ্যতাই সব সময় সব কিছুর মাপকাঠি নয়; এখানে এ কথাটির উপরই গুরুত্ব দেয়া আমার উদ্দেশ্য। অবশ্য যে ইয়েটস একসময় রবীন্দ্রনাথের প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন এবং তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ পরবর্তীতে তিনিই এক সময় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখেন ঃ

"Damn Tagore. We got out three good books... and then, because he thought it more important to see and know English than to be great poet, he brought out sentimental rubbish and wrecked his reputation. Tagore does not know English, no Indian knows English. No body can write with music and style in a language not learned in chiddhood and ever since the language of his thought".

কবি ইয়েটস-এর কথায় অবশ্যই কিছুটা বাড়াবাড়ি আছে। রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে একজন বড় কবি। তাছাড়া, যদিও রবীন্দ্রনাথ একবার ইংরেজী পড়ার জন্য এবং দ্বিতীয় বার ব্যারিস্টারী পড়ার জন্য বিলেত গিয়েছিলেন কিন্তু কোনটাই শেষ করতে পারেননি, তবু তিনি ইংরেজী জানতেন না, একথার মধ্যে অবশ্যই অতিশয়োক্তি রয়েছে। তিনি তাঁর গীতাঞ্জলীর ইংরেজী অনুবাদ নিজেই করেছিলেন। এটাও তাঁর ইংরেজী জানার প্রমাণ। তবে ইংরেজদের মতো ইংরেজীতে চিন্তা-কল্পনার স্ফুরণ ঘটানো অইংরেজের পক্ষে দুষ্কর বই কি! মহাকবি মধুসূদন দত্তের মতো কালজয়ী প্রতিভা– যিনি ইংরেজীতেই লেখাপড়া করেন, ইংরেজীতে ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা করেন, তাঁর পক্ষেও তা সম্ভব হয়নি, এটা আমরা সকলেই জানি। ফলে মধুসূদন ইংরেজি ভাষার চর্চা পরিত্যাগ করে পরবর্তীতে তাঁর মাতৃভাষা বাংলায় সাহিত্য চর্চা করেই যশস্বী হন।

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি সম্পর্কে প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক, রবীন্দ্র-গবেষক ও অনুবাদক উইলিয়ম রাদিচে একবার বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাওয়াটা ঠিক আছে কিন্তু তিনি সেটা ভুল কারণে পেয়েছিলেন। রাদিচের বক্তব্য হলো রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোন মৌলিক রচনার জন্য নয়, স্বকৃত কতিপয় কবিতার ইংরেজী অনুবাদ সংবলিত 'Song Offerings' কাব্যের জন্য এ মহামূল্য প্রাইজ লাভ করেন। Song Offerings মূলতঃ রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলীর' অনুবাদ হলেও এটা স্বচ্ছন্দ, স্বাধীন অনুবাদ। মূলের সাথে এটার সর্বদা মিল খোঁজার চেষ্টা অবান্তর। গীতাঞ্জলীতে নেই এমন কিছু কবিতাও এতে স্থান লাভ করেছে। সম্ভবতঃ সেজন্যই এটা যে অনুবাদ কাব্য সে কথাটাও তিনি কোথাও উল্লেখ করেননি। অতএব, রবীন্দ্রনাথ যে কাব্যটির জন্য নোবেল পুরস্কার পান, সেটা আর গীতাঞ্জলী সম্পূর্ণ এক জিনিস নয়।

www.pathagar.com

'Song Offerings'-এর ক্ষেত্রে আরো অভিযোগ এই যে, এর অধিকাংশ কবিতাই মানোত্তীর্ণ নয় এবং এরদ্বারা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রকৃত পরিচয় লাভও সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট কবি ও সমালোচক বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'কবি রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের 'ইংরেজীতে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে রবীন্দ্রনাথ Gitanjali বা Song Offerings গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হবে এমন কবিতা/গানের অনুবাদ শুরু করেন ১৯১২ সনের বসন্তকালে - "এক ছুটির প্রহরে খেলাচ্ছলে কিন্তু খেলা ক্রমে ক্রমে এমন জমে উঠলো যে, লন্ডনগামী জাহাজে যেতে যেতে এক খাতা ছাপিয়ে আর এক খাতায় পৌঁছলেন।"

লন্ডন পৌঁছে এ ইংরেজী কবিতাগুলোই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজ বন্ধু রোদেনস্টাইন, চার্লস এন্ড্রুজ, ইয়েটস প্রমুখ কবি-শিল্পীদের পড়ে শোনান। শুনে তাঁরা মুগ্ধ হন। কবি ইয়েটস স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ষোল পৃষ্ঠাব্যাপী একটি ভূমিকা লিখে দেন, যা বইটির তথা রবীন্দ্রনাথের পাশ্চাত্য-জগতে পরিচিতি তুলে ধরতে যথেষ্ট সহায়ক হয়।

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আর একটি কথা। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলী আর Song Offerings সম্পূর্ণ এক জিনিস নয়। তবে মোটামুটিভাবে দ্বিতীয়টি প্রথমটিরই ইংরেজী অনুবাদ। অনুবাদও যথেষ্ট মানোত্তীর্ণ নয় বলে অনেকের ধারণা। পরবর্তীতে (১৯৩৫ সনে) ইয়েটস এগুলোকে বলেছেনঃ 'Sentimental rubbish', সাধারণতঃ পুরস্কারপ্রাপ্তগণ তাঁদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্মের জন্যই পুরস্কার পেয়ে থাকেন। কিন্তু সকলেই জানেন, রবীন্দ্রনাথের 'Song Offerings' তথা 'গীতাঞ্জলী' তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্ম হিসাবে বিবেচিত নয়। ইতোপূর্বে রচিত তাঁর 'মানসী', 'বলাকা,' 'চিত্রা', 'সোনার তরী' ইত্যাদি কাব্য এর চেয়ে উন্নত মানের। এ জন্যই রাদিচে বলতে চেয়েছেন যে, তাঁর নোবেল পুরস্কার পাওয়াটা সঠিক, কিন্তু যে কারণে পেয়েছেন তা সঙ্গতভাবেই প্রশ্নের উদ্রেক করে।

তবে একটি বিষয় বিবেচনা করলে হয়ত এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে। Song Offerings তথা 'গীতাঞ্জলী' কাব্যে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ বা অনুগত প্রাণের নিবেদিত চিত্ততার যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে ইংরেজ-প্রভুদের নিকট তার হয়তো একটি আলাদা মূল্য ও গুরুত্ব ছিল। সে সময় বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের অংশ হিসাবে হিন্দুরা বিলাতী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী আন্দোলন শুরু করে। ইংরেজদের উপর চাপ সৃষ্টি করে বঙ্গভঙ্গ রদ করাই ছিল এর মূল লক্ষ্য। ভারতীয় মুসলমানগণও ১৯০৬ সনে 'মুসলিম লীগ' গঠন করে আত্মসচেতন ও অধিকার-সচেতন হয়ে ওঠার প্রয়াস পায়। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ রদ করার পক্ষে থাকলেও স্বদেশী আন্দোলন বা ইংরেজ-বিরোধী কোন কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। এ সময় ইংরেজদের অনুগত প্রাণের প্রয়োজন ছিল যথেষ্ট। তাই রবীন্দ্রনাথের কদর করা কৌশলগত দিক থেকে তারা প্রয়োজন মনে করেছিল। হয়ত এ জন্যই রবীন্দ্রনাথের প্রতি ঐ সময় তাদের সুদৃষ্টি পড়ে।

www.pathagar.com

তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিকে এতটুকু খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। তবু প্রসঙ্গতঃ এসব কথার অবতারণা এজন্য যে, নোবেল পুরস্কারের মত সম্মানজনক পুরস্কারও সর্বদা নিরপেক্ষ মানদণ্ডে বিচার করা হয়না, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক ও গোষ্ঠী-স্বার্থ ও চিন্তা এ পুরস্কার বিতরণে প্রভাব বিস্তার করে থাকে এবং রবীন্দ্রনাথের জীবন, ব্যক্তিত্ব, পরিবেশ ও সাহিত্য সে প্রভাব-বলয়ের মধ্যে পড়ে বলেই এসব কথা অনেকের মনে উঁকি-ঝুঁকি মারে। নইলে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভের জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

জাতীয় কবি

১৯১১ খৃস্টাব্দে ইংল্যান্ডের রাজার প্রশস্তি গেয়ে রবীন্দ্রনাথ যে গান রচনা করেছিলেন, সে গানটি পরবর্তীতে স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয়, কেননা তাতে অখণ্ড ভারতের জয়গানও গাওয়া হয়েছে। এর মূল থীমটি ছিল অখণ্ড বঙ্গ এবং তাৎক্ষণিক লক্ষ্য ছিল বঙ্গভঙ্গ রদ। অপর দিকে, মুসলিম স্বার্থ-বিরোধী বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের পটভূমিতে তিনি যে গান রচনা করেছিলেন, কোন কিছু চিন্তা-ভাবনা না করেই একটি বিশেষ মহল সেটিকেই স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত করেন। অথচ ভৌগোলিক দিক থেকে, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব তথা রাষ্ট্রিক অবস্থান থেকেএবং আমাদের আদর্শ-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি এর কোন দিক থেকেই ঐ গানটি আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হবার উপযুক্ত নয়। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, মুক্তিযোদ্ধা ও প্রবীণ বুদ্ধিজীবী প্রফেসর ডক্টর এবনে গোলাম সামাদের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেনঃ

"রবীন্দ্র সাহিত্য পড়ে যারা আনন্দ পেতে চান, তারা তা পেতে পারেন। কিন্তু আমি রবীন্দ্রনাথের গানকে জাতীয় সঙ্গীত করার বিরোধী। কারণ, রবীন্দ্রনাথের সাথে আমাদের আজকের জাতীয় চেতনার কোন ঐতিহ্যগত যোগসূত্র নেই। আজকের বাংলাদেশ মূলতঃ বাংলাভাষী মুসলমানের সংগ্রামের ফল। আর এর আছে একটা পৃথক ইতিহাসের ধারা। রবীন্দ্রনাথ এই ইতিহাসের কেউ নন। তাছাড়া আজকের বাংলাদেশ আর রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা এক ব্যঞ্জনা বহন করে না।" (পূর্বোক্ত)।

রবীন্দ্রনাথ যে সোনার বাংলার কথা বলেছেন সেটা যুক্ত বাংলা। সেখানকার জমিদার হিন্দু, ব্যবসায়ী হিন্দু, আমলা হিন্দু, সমাজপতিরা সব হিন্দু, শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তারাই সর্বেসর্বা। আর মুসলমানরা সেখানে কৃষক, খান-সামা, পাইক, পেয়াদা, বরকন্দাজ, চাপরাসি, শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও তারা অপাংতেয়, দরিদ্র, অবহেলিত, অবজ্ঞাত 'মুচলমান' মাত্র। রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলায় বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর কীর্তন, বাউলের উদাস করা গান, ভজন-কীর্তন, সন্ধ্যা আরতি, নৈবেদ্য, আবীর, শিবাজী উৎসব, হোরি খেলা, রাখিবন্ধন, ভাই ফোঁটা, তিলক-চন্দন, ধূপ-ধূনা, ধান-দুর্বা, মঙ্গল প্রদীপ, গেরুয়া বসন, পৈতা, ধূতী-চাদরের সমাহার আর বার মাসে তের পার্বণের বিচিত্র আয়োজন। সোনার বাংলার ভিৎ

www.pathagar.com

বৈদিক যুগে বেদ-উপনিষদের আদর্শে স্থাপিত পৈতাধারী তপোবনবাসীদের তা অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র, অখণ্ড ভারতের বৃহৎ দেহে লীন হওয়ার আবেগ-অভীপ্সায় তা দুর্মর।

অথচ বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশ এক দীর্ঘ ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উত্তরণের ফল। দীর্ঘ বঞ্চনা, অবহেলা ও অবজ্ঞার নিদারুণ, দুঃসহ অবস্থা থেকে সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা, সংগ্রাম ও অসংখ্য প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। এদেশের মানুষের প্রত্যূষে ঘুম ভাঙ্গে সুমধুর আযানের সুরে। সুবেহ্ সাদিকে মসজিদে জামায়াতে ফযরের নামায আদায়ের পর এদেশবাসীর দিনের কাজ শুরু হয়। মুর্শিদী, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী, মর্শিয়া, মিলাদ, ওয়াজ মাহফিল, হামদ, নাতের মধুর আবেগে মাতোয়ারা এখানকার পরিবেশ। রোযা, ঈদ, কুরবানী, হজ্জ, মহররম, শবে বরাত, শবে কদর, সীরাতুন্নবী ইত্যাদির দ্বারা অনুপ্রাণিত বাংলাদেশের মানুষের জীবন। লুঙ্গি, পাজামা, পাঞ্জাবী, টুপি, পাগড়ি, সালোয়ার-শাড়ি-কামিজ ইত্যাদি আমাদের সাধারণ পোষাক। ১৭৫৭ সনে ইংরেজের নিকট আমাদের স্বাধীনতা বিপন্ন হবার পর থেকে একের পর এক দুর্বার স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার পর ১৯৪৭ সনে যুক্ত ভারতের বুক ফুঁড়ে পাকিস্তান এবং সবশেষে ১৯৭১ সনে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে অগণিত প্রাণের বিনিময়ে অপরিসীম ত্যাগ ও সংগ্রামের মাধ্যমে যে স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে তার সাথে রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলার বিস্তর পার্থক্য। উভয়ের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি যেমন আলাদা, উভয়ের আদর্শ, ভাবাবেগ, অভীপ্সাও তেমনি আলাদা, সর্বোপরি উভয়ের লক্ষ্য, স্বপ্ন-কল্পনা ও বেঁচে থাকার তাগিদও আলাদা।

রবীন্দ্রনাথের আদর্শ হলো মহাভারতের আদর্শ, তাঁর দর্শন হলো বেদ উপনিষদ-উদ্ভূত, তাঁর বিশ্বাস হলো অবতারবাদ, বহুত্ববাদ, পৌত্তলিকতা ও পুনর্জন্মে, তাঁর অনুসৃত ব্যক্তিত্ব হলেন প্রাচীন মুনি-ঋষী-তপোবন সাধক সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ আর তাঁর জাতীয় বীর হলেন দাক্ষিণাত্যের ঠগ-দস্যু মুসলিম-নিধনকারী ছত্রপতি শিবাজী। অন্যদিকে, বাংলাদেশী শতকরা নব্বইজন মানুষের আদর্শ হলো ইসলাম, দর্শন হলো তৌহিদ; রিসালত, আখিরাত (কিয়ামত, হাশর, বেহেশত-দোযখ ইত্যাদি), অনুসৃত ব্যক্তিত্ব হলেন নবী-রসূল-সাহাবায়েকেরাম-আউলিয়া-দরবেশ, জাতীয় বীর হলেন হামজা-খালিদ-মুসা-তারিক-মুহম্মদ বিন কাসিম-বখতিয়ার-শাহজালাল-ঈসা খাঁ-তীতুমীর-হাজী শরীয়তুল্লাহ প্রমুখ। তাই রবীন্দ্রনাথ যত বড় কবিই হন, তিনি আমাদের জাতীয় কবি নন। আর সে কারণেই তাঁর লেখা গানও আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হবার অনুপযুক্ত।

জাতীয় কবির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো তিনি জাতির সর্বশ্রেণীর মানুষের জীবন, ভাব, আশা, আনন্দ, দুঃখ-বেদনা, স্বপ্ন-কল্পনা, উদ্যম-উদ্দীপনার সাথে একান্তভাবে অবিমিশ্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেক্ষেত্রে বলতে গেলে আমাদের কেউ নন। বাংলাদেশের শতকরা নব্বই জন মানুষের জীবন রবীন্দ্র-সাহিত্যে অনুপস্থিত। তাই রবীন্দ্র-সাহিত্য আমাদেরকে আনন্দ দিলেও আমাদের চিত্তকে তা উদ্বোধিত করে না, আমাদের আশা-আনন্দ, স্বপ্ন-কল্পনা,

www.pathagar.com

আনন্দ-উদ্দীপনার সাথে তার কোন সঙ্গতি নেই। রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠে আনন্দ আছে। তবে এরূপ আনন্দ আমরা শেলী, কীট্স, বায়রন, ইয়েটস, ফেরদৌসী, হাফিজ, ওমর খৈয়াম, ইকবাল থেকেও পেতে পারি। কিন্তু তাঁরা আমাদের প্রিয় কবি হলেও জাতীয় কবি নন। রবীন্দ্রনাথও তাই। তবে তিনি যেহেতু আমাদের ভাষার কবি তাই তাঁর প্রতি আমাদের আবেগের আধিক্যও স্বাভাবিক। কিন্তু সঙ্গত কারণেই তিনি আমাদের জাতীয় কবি নন।

আমাদের জাতীয় কবির মর্যাদা লাভ করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি আমাদের জাতীয় জাগরণের তূর্যবাদক, তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে পরাধীনতার শৃংখল-মুক্তির গান গেয়েছেন। দরিদ্র, ক্ষুধিত, বঞ্চিত, ভাগ্যহত নির্যাতিত মানুষের কথা বলেছেন তিনি তাঁর কাব্যে। সামাজিক বিভেদ, অন্যায় অবিচার, জুলুম নির্যাতন ও অধর্ম-অসাম্যের বিরুদ্ধে নিঃসংকোচে কথা বলেছেন তিনি। মুসলিম নবজাগরণের উচ্চকিত বাণীর পাশাপাশি সকল শ্রেণীর মানুষের কথা তাঁর কবিতায় বাণী-রূপ লাভ করেছে। তাই 'নাইট' উপাধি আর 'নোবেল' পুরস্কারের বদলে তাঁর ভাগ্যে জুটেছে জেল-জুলুম-নিগ্রহ আর নিদারুণ দুঃসহ দারিদ্র্য ও বঞ্চনা।

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের এ ধরনের পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে প্রখ্যাত নাট্যকার ওবায়দুল হক সরকারের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটাতে চাই। তিনি বলেন ঃ "কবি কাজী নজরুল ইসলাম হিন্দু ও মুসলিম উভয়কে নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র হিন্দুকে নিয়ে লিখেছেন। তাঁর কোনো লেখায় মুসলমানকে নিয়ে কিছুই লেখেন নি। বাংলার বার ভূঁইয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ভূঁইয়া ঈশা খাঁ পর্যন্ত তাঁর নিকট অপাংক্তেয়। আশ্চর্য বাঙালী ঈশা খাঁকে নিয়ে কবিতা লেখেন নি। লিখেছেন অবাঙালী শিবাজীকে নিয়ে। এই মারাঠা দস্যুকে তিনি দেবতা বানিয়েছেন–যেহেতু সে হিন্দু।" (ওবায়দুল হক সরকার : সংস্কৃতি সংহার, মাসিক জিজ্ঞাসা, এপ্রিল, ১৯৯৮)।

অতএব, রবীন্দ্রনাথকে আমরা একজন অসাধারণ বড় কবি হিসাবে মানতে ও শ্রদ্ধা করতে বাধ্য, বিশ্বমানের নোবেল-বিজয়ী বাংলা ভাষার কবি হিসাবে তাঁকে নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি, কিন্তু তিনি আমাদের বিশ্বাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জাতীয় আশা-আকাংক্ষার প্রতীক বা প্রতিনিধিত্বকারী কবি নন। এ জন্য আমরা অবশ্যই আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে থাকি।

তাই রবীন্দ্রনাথকে তাঁর স্বস্থানে রেখেই তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব এবং সেটাই সর্বদা অভিপ্রেত। বলাবাহুল্য, একথা সকলের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য। যার যতটুকু পাওনা, তাকে ততটুকু দিতে হবে। কম দেয়ার বা অধিক দেয়ার প্রবণতা আমাদের অবশ্যই পরিহার করতে হবে। ন্যায় বিচারের স্বার্থেই এটা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ

বাংলা সাহিত্য তথা বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৬১-১৯৪১]। বাংলা সাহিত্য বর্তমানে যে অবস্থায় উপনীত হয়েছে সে জন্য যে চারজন অবিস্মরণীয় প্রতিভা প্রধানত দায়ী তাঁরা হলেনঃ মাইকেল মধুসূদন দত্ত [১৮২৪-১৮৭৩], বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [১৮৩৮-৯৪], রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম [১৮৯৯-১৯৭৬]। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতায় অভিভূত মধুসূদন পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার উন্মেষ ঘটান। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা কথা-সাহিত্যে প্রথম সার্থক শিল্পী। কিন্তু উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কারণে তিনি সর্বশ্রেণীর পাঠকের নিকট জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেননি। সাহিত্য-শিল্পকলার সাথে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা সহ-অবস্থান করতে পারেনা। তাই রবীন্দ্রনাথের এবং তারপর কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের সাথে সাথে বঙ্কিমচন্দ্র অনেকটাই অপ্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয়। সাম্প্রদায়িক আবেদনের কারণে বঙ্কিমচন্দ্র এক সময় সম্প্রদায় বিশেষের নিকট 'সাহিত্য সম্রাট', 'ঋষি' ইত্যাদি অভিধা পেলেও তাঁর সাহিত্যের আবেদন রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের আগমনের পর অনেকটাই নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী মধুসূদনের যুগান্তকারী আবেদনও রবীন্দ্রনাথের নিকট অনেকটা ম্লান হয়ে পড়ে। অবশ্য এজন্য মধুসূদনের ফোর্ট উইলিয়মীয় সংস্কৃত-প্রধান দুর্বোধ্য বাংলাও খানিকটা দায়ি বটে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের আবেদন ছাড়াও তাঁর ভাষার সহজতা, সরলতার কাছে মধুসূদনের দুর্বোধ্য সংস্কৃতবহুল ভাষা পাঠকপ্রিয়তা হারায়। ফলে রবীন্দ্র-যুগে সাহিত্যের সকল শাখায় রবীন্দ্রনাথ একাধিপত্য অর্জন করেন। জনৈক সমালোচকের ভাষায়ঃ

"বাঙ্গালীর ভাব, বাঙ্গালীর ভাষা, তাহার কথা বলার ভঙ্গী, তাহার চালচলন, তাহার প্রতিদিনের প্রত্যেক কাজে রবীন্দ্রনাথ এমনই প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যে, 'রাবীন্দ্রিক' হইতে পারা যে কোন নবীন শিক্ষিতের কাছে একটি গৌরবের বিষয় হইয়া পড়িল।" (দ্র. নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ানঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৯২, পৃ. ৫৩৪)।

কথাটির মধ্যে খানিকটা অতিশয়োক্তি থাকলেও একেবারে ভিত্তিহীন নয়। রবীন্দ্র-যুগে সাহিত্যের সকল শাখায় রবীন্দ্রনাথের এমন অনিবার্য প্রভাব ছিল যে, সে প্রভাবের বাইরে এসে সাহিত্য-চর্চা করা খুবই কঠিন ছিল। তখন সাহিত্যের ভাব, ভাষা, ভঙ্গী সবখানেই রাবীন্দ্রিক প্রভাব অনেকটা অনিবার্য হয়ে পড়েছিল।

www.pathagar.com

এভাবে রবি-করোজ্জ্বলে বাংলা সাহিত্যের দিগন্ত যখন সমুদ্ভাসিত ঠিক তখনই ধূমকেতুর মত আবির্ভাব ঘটে কাজী নজরুল ইসলামের। রঙধনুর সাতরঙা ডানায় ভর করে কালবোশেখীর প্রলয় বেগে নজরুল এসে বাংলা সাহিত্যের নিস্তরঙ্গ বুকে উত্তুঙ্গ তরঙ্গাভিঘাতের সৃষ্টি করলেন। নতুন ভাব, নতুন ভাষা, নতুন বিষয়, নতুন দ্যোতনা ও নতুন ভঙ্গীতে নজরুল এমন এক সাহিত্য সৃষ্টি করলেন, যা বিষয়-ভাব-ভাষা ও আবেদনে রবীন্দ্রনাথ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ফলে রবীন্দ্র-সমকালেই এক নতুন নজরুল-যুগের সূত্রপাত ঘটলো। স্বাদে-গন্ধে, রূপ-রস-সৌরভে রবীন্দ্র-সাহিত্য থেকে নজরুল সাহিত্য হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই ১৯২৯ সনে পূর্ণ পরিণত রবীন্দ্র-খ্যাতি যখন সর্বোচ্চে সে সময়েই হিন্দু-মুসলিম মিলিতভাবে কলকাতার এলবার্ট হলে নজরুলকে বাঙালির 'জাতীয় কবি' বলে সম্বোধন করা হয়। নজরুল বাংলাদেশের জাতীয় কবি রূপে বরিত হন এর বিয়াল্লিশ বছর পর।

বাংলা সাহিত্যের বর্তমান সুসমৃদ্ধ অবস্থার পেছনে উপরোক্ত চার কালজয়ী প্রতিভার অসামান্য ও বৈচিত্র্যপূর্ণ অবদানের কথা সর্বজনবিদিত। এখানে অন্যদের সম্পর্কে নয়, শুধু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এবং পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ– শুধু এ সম্পর্কেই কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়াস পাব।

রবীন্দ্রনাথ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা খুব একটা অর্জন করতে না পারলেও তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত। তিনি ছিলেন উচ্চবিত্ত এবং সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশের সন্তান। তাঁর পারিবারিক পরিবেশ ছিল অভিজাত ও সংস্কৃতিবান। সমাজের সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিরা সেখানে সর্বদা যাতায়াত করতেন। পারিবারিক, সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পদস্থ ইংরেজরাও সেখানে যাতায়াত করতেন। রবীন্দ্রনাথের দাদা দ্বারকানাথ ঠাকুরকে ইংরেজরা 'প্রিন্স' উপাধি প্রদান করেন। পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) ছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭৪-১৮৩৩) প্রতি গভীর অনুরাগী এবং রামমোহন-প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের নিষ্ঠাবান অনুসারী। দেবেন্দ্রনাথ পারস্যের সুফী কবিদেরও অনুরাগী ছিলেন এবং তাঁদের রচিত সুফীতত্ত্ব বিষয়ক গযল-কবিতা পাঠে আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা লাভ করতেন। পরিবারে বাংলা, ইংরেজী ও ফারসী শিক্ষকগণও ছিলেন। এভাবে তিনি পারিবারিক পরিবেশেই বিভিন্ন বিষয় এবং তৎসঙ্গে বিভিন্ন ভাষা শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মাতৃভাষা বাংলা চর্চা সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

"তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়ীতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন।"

রবীন্দ্রনাথ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাননি। স্কুলে তিনি কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। সেখানে বিদ্যাভ্যাসের অভিজ্ঞতাটিও তাঁর নিকট বিশেষ সুখকর ছিল না। স্কুল কলেজের বাঁধা-ধরা নিয়ম-শৃংখলা এবং রীতি-নীতি রবীন্দ্রনাথের ধাতে সয়

www.pathagar.com

নাই। তাই তাঁর অভিভাবকগণ গৃহ-শিক্ষকের নিকট তাঁর বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সেখানেও রবীন্দ্রনাথের মন ঠিকমত বসে নাই। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক পরিবেশও ছিল শিক্ষা-দীক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে যথেষ্ট উন্নত। সেখানে সমাজের বিত্তশালী, দেশী-বিদেশী উচ্চ রাজকর্মচারী, সাহিত্য-সংস্কৃতিসেবী, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের সর্বদাই যাতায়াত ছিল। এ উন্নত পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব তাঁর জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিগঠনে যথেষ্ট সহায়ক ছিল।

এভাবে স্কুল বা কোন শিক্ষকের নিকট বিদ্যাশিক্ষার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনাগ্রহ সত্ত্বেও তাঁর বিদ্যাশিক্ষা অসম্পূর্ণ ছিল না। তাঁর পরিবারের আলোকিত পরিবেশ ও আবহাওয়া থেকে তিনি অনেক কিছু শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই লিখেছেন ঃ

"ছেলেবেলায় আমার মস্ত সুযোগ এই ছিল যে, বাড়ীতে দিনরাত্রি সাহিত্যের হাওয়া বহিত।... আমার খুড়তুত ভাই গণেন্দ্র দাদা তখন রামনারায়ণ তর্করত্নকে দিয়া নবনাটক লিখাইয়া বাড়ীতে তাহার অভিনয় করাইতেছেন। বাংলার আধুনিক যুগকে যেন তাঁহারা সকল দিক দিয়াই উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। অনেক ইতিহাস তিনি বাংলায় লিখিতে আরম্ভ করিয়া অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত ব্রহ্ম সঙ্গীতগুলি এখনো ধর্ম সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে।"

রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পুরুষ পঞ্চানন ঠাকুর তাঁদের আদি নিবাস যশোর থেকে এসে গোবিন্দপুর গ্রামে বাসস্থান নির্মাণ করেন। এর কিছুকাল পরেই গোবিন্দপুর, সুতানটি ও কালিঘাট এ তিনটি গ্রাম নিয়ে কলকাতা শহর স্থাপিত হয়। পঞ্চানন ঠাকুরের পূর্বে এ বংশে কেউ 'ঠাকুর' নামে পরিচিত ছিল না। তবে পঞ্চানন ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে জানা যায়। ইংরেজ আমলে তিনি 'ঠাকুর' পদবী লাভ করেন। গোবিন্দপুরের যে অংশে পঞ্চানন বাস করতেন সেখানে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বাড়ী গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের পিতৃপুরুষ পরে জোড়াসাঁকোতে বাসস্থান স্থাপন করেন। পঞ্চাননের পুত্র জয়রাম কোম্পানী আমলে চব্বিশ পরগনায় আমিনের কাজ করতেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাথে পিতা-পুত্রের ঘনিষ্ঠতা ছিল। জয়রাম ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মাণের কাজে ঠিকাদারীর সংস্রবে থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ১৭৬২ সনে জয়রামের মৃত্যু হয়।

জয়রামের দুই পুত্র দর্পনারায়ণ ঠাকুর ও নীলমনি ঠাকুর। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ ছাড়াও নীলমণি আলিপুরের ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের সেরেস্তাদারী করে প্রচুর অর্থোপার্জন করেন। নীলমণির পুত্র প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের পিতামহ। দ্বারকানাথ প্রথমে সেরেস্তাদারী, পরে দেওয়ানের চাকুরী করে অতঃপর ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোনিবেশ করেন। চাকুরী এবং ব্যবসা উভয়টিতে তাঁর বিপুল অর্থাগম ঘটে। ব্যাংক, কয়লার খনি, লবণ, চিনি, চা ইত্যাদি ব্যবসায়ে তাঁর প্রচুর আয় হয়। উপরন্তু তিনি

www.pathagar.com

বহরমপুর ও কটকের জমিদারী লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি নিজের চেষ্টায় হুগলি, পাবনা (বর্তমানে সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর), রাজশাহী (বর্তমান নওগাঁ জেলার পতিসর), মেদিনীপুর, রংপুর ও ত্রিপুরা জেলায় জমিদারী হস্তগত করেন। এছাড়াও তিনি তত্ত্ববোধিনী ছাপাখানা, তত্ত্ববোধনী সমাজ ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং বেদ-উপনিষদ ইত্যাদি চর্চা ও ধর্মালোচনায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। ইংরেজদের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর এতসব প্রাপ্তির পিছনে তিনি এ সম্পর্ককে সুকৌশলে কাজে লাগিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজা রামমোহন রায়ের ঘনিষ্ঠ সহচর ও একান্ত অনুরাগী ছিলেন। ইংরেজ আমলে ইংরেজী ভাষা শিখে, ইংরেজদের শিক্ষা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে অনেক হিন্দু খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করে। অনেকে হিন্দুধর্মে সংস্কার সাধন করে তা রক্ষার চেষ্টা করে। এঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) হিন্দুধর্ম সংস্কারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। এতে আল-কুরআন, বেদ-উপনিষদ, বাইবেল ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটেছে। রামমোহন আরবী, ফারসী, ইংরেজী, সংস্কৃত, বাংলা প্রভৃতি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। কুরআন পড়ার পর তিনি ইসলামের তৌহিদবাদের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং পৌত্তলিকতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন। অতঃপর কুরআনের তৌহিদ বা একত্ববাদের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধর্মের সারাংশ ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয়ে ব্রাহ্মধর্মের প্রচলন করেন। মূলত এটা ছিল হিন্দুধর্মের নতুন সংস্করণ। শিক্ষিত হিন্দু যারা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খৃস্টান ধর্ম গ্রহণে উৎসাহী হয়ে ওঠে, তাদেরকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যেই এ নতুন ধর্মমতের প্রবর্তন। রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। রবীন্দ্রনাথও পিতা দেবেন্দ্রনাথের মতোই রামমোহনের অতিশয় ভক্ত ছিলেন। রামমোহন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত উক্তি থেকেই তা সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ঃ

"বর্তমান বঙ্গসমাজের ভিত্তি স্থাপন করেছেন রামমোহন রায়। আমরা সমস্ত বঙ্গবাসী তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, তাঁহার নির্মিত ভবনে বাস করিতেছি। তিনি আমাদের জন্য যে কত করিয়াছেন, কত করিতে পারিয়াছেন, তাহা ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিলে তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও স্বজাতির প্রতি বিশ্বাস জন্মিবে।"

রামমোহন যথার্থই হিন্দু নবজাগরণের অন্যতম প্রাণ-পুরুষ ছিলেন। তাই তাঁর প্রতি এরূপ ভক্তি-ভাবের কারণে রবীন্দ্রনাথও প্রথম জীবনে ব্রাহ্মধর্মেরই অনুসরণ করেন। তবে পরবর্তীতে ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ায় এবং ক্রমে এদের অনুসারীদের সংখ্যাও হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আর নিষ্ঠাবান থাকতে পারেননি এবং নিজেকে তিনি একজন হিন্দু বলে পরিচয় দিতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন।

www.pathagar.com

হিন্দুর বেদ-পুরান ও ইরানী সুফীবাদে রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান ও আকর্ষণ ছিল প্রবল। ব্রাহ্মমতও তাঁর মানস-গঠনে প্রভাব বিস্তার করেছে। উপরন্তু ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভাষা-সাহিত্যের প্রতিও তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। এসব কিছুর সমন্বয়েই রবীন্দ্র-মানস পরিগঠিত হয়। তাই আনুষ্ঠানিক বিদ্যাশিক্ষা ততটা অর্জিত না হলেও অনানুষ্ঠানিক বিদ্যার্জন, জ্ঞানানুশীলন ও বাস্তব অভিজ্ঞতার যে অসাধারণ সুযোগ তাঁর জীবনে এসেছিল তা নিতান্ত তুলনাবিরল। এবং এরই প্রতিফলন ঘটেছে বিশাল রবীন্দ্র-সাহিত্য।

ইংরেজের দেয়া পদবী, জমিদারী, ব্যবসা-বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা এবং অন্যান্য বিবিধ আনুকূল্য লাভের কারণে ঐতিহ্যগতভাবে ঠাকুর পরিবার ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসে। রবীন্দ্রনাথ উত্তরাধিকার সূত্রে সে ঐতিহ্যের নিষ্ঠাবান ধারক। উপরন্তু ইউরোপীয় শিক্ষা-সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহচর্যে এসে তিনি পাশ্চাত্যের প্রতি অনেকটা মোহমুগ্ধ হয়ে পড়েন। তবে এটাকে কোনক্রমেই অন্ধতা বলা যায় না; কারণ প্রাচ্যের প্রতি বিশেষত উপনিষদীয় প্রাচীন হিন্দু ভারতীয় সভ্যতার প্রতি তাঁর আকর্ষণ সর্বদাই ছিল প্রবল। সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে তারই প্রতিভাস লক্ষণীয়।

রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতা ও বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রার প্রতি মোহমুগ্ধ থাকা সত্ত্বেও হিন্দুত্ব কখনো পরিত্যাগ করেননি। প্রথম জীবনে তিনি রামমোহন ও পিতা দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেও পরবর্তীতে হিন্দুধর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের মূল শিক্ষাকে একীভূত করে নিলেও মনের দিক থেকে সর্বদা হিন্দুত্বের আদর্শকেই তিনি উন্নততর বলে বিবেচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ মাত্র সতের বছর বয়সে ১৮৭৮ সনে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিশেষত ইংরেজী শেখার জন্য প্রথম ইংল্যান্ড গমন করেন। বছর দু'য়েক ঐ সময় তিনি ইংল্যান্ডে ছিলেন। ঐ দুই বছরে আনুষ্ঠানিক কোন শিক্ষা বা কোন ডিগ্রী তিনি হাসিল করেননি। তবে দেশ ভ্রমণে তাঁর প্রচুর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হাসিল হয়। ঐ সময়কার কথা বলতে গিয়ে তিনি এক চিঠিতে লেখেন ঃ

"Before I came to England, I supposed it was such a small island and its inhabitants were so devoted to higher culture that from one end to the other it would resound with the strains of Tennsyon's lyre."

পাশ্চাত্যের প্রতি মোহ-মুগ্ধতা সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে যে দৃষ্টিতে দেখেছেন তা খুব একটা সুখকর নয়। ১৯১৩ সনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতাঞ্জলী কাব্যের ইংরেজী অনুবাদের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। অবশ্য অনূদিত কাব্যটি হুবহু গীতাঞ্জলীর ভাষান্তর নয়। গীতাঞ্জলীর সবগুলো কবিতা যেমন এতে স্থান পায়নি, তেমনি রবীন্দ্রনাথের অন্য কয়েকটি কাব্যের কিছু সংখ্যক কবিতার অনুবাদও এতে স্থান লাভ করেছে। তাছাড়া, এ অনুবাদ হুবহু ভাষান্তরিতও ছিল না, ছিল স্বাধীন অনুবাদ। সে যাইহোক, পুরস্কার পাওয়ার কিছুদিন পর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টর অব

www.pathagar.com

লিটারেচার' উপাধি লাভ করেন। ইংরেজ সরকার ঐ সময় তাঁকে 'স্যার' উপাধিও প্রদান করেন। অবশ্য পরবর্তীতে জালিয়ানওয়ালাবাগের বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ সরকারের দেয়া 'স্যার' উপাধি বর্জন করেন।

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার ব্যাপারে পাশ্চাত্যের যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে জোর তদবীর করেছিলেন প্রখ্যাত ইংরেজ কবি ডবলিউ বি ইয়েট্স তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। তিনি রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলীর ইংরেজী অনুবাদ দেখে তাতে একটি দীর্ঘ ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন এবং নোবেল কমিটিতে রবীন্দ্রনাথের নাম সুপারিশ করেছিলেন। ঐ সময় ইয়েট্স লিখেছিলেন, "রবীন্দ্রনাথ আমাদের সকলের চেয়ে বড়।" কিন্তু পরবর্তীকালে ১৯৩৫ সনে ইয়েট্স রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখেন ঃ

"Damn it Tagore. We got out three good books... and then, because he thought it more important to see and know English than to be great poet, he brought out sentimental rubbish and wrecked his reputation. Tagore does not know English, no Indian knows English. No body can write with music and style in a language not learned in childhood and ever since the language of his thought."

পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট দার্শনিক ও নাট্যকার বার্নাড শ', যিনি তাঁর একটি নাটকের একটি চরিত্রের নামকরণ করেন স্টুপেন্দ্রনাথ বেগর (Stupendranath Begorr), (Rabindranath Tagore নামের বিকৃতি) রসিকতাচ্ছলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি এক বার কটাক্ষ করে বলেন ঃ "(Old Bluebeard, how many wives has he got, I wonder!"

পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল (Bertrand Russell) একবার এক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শোনার পর তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে লেখেনঃ "It was unmitigated rubbish-cut-and dried conventional stuff about the river becoming one with Brahma... The man is sincere and in earnest, but merely rattling old dry bones."

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য জগৎ-বিখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের মনে কোনই দাগ কাটতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-দর্শনও তাঁর নিকট নিরেট অর্থহীন মনে হয়েছে। তাই অন্য আর এক প্রসঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখেনঃ "His talk about the infinite is vague nonsense. The sort of language that is admired by many Indians unfortunately does not, in fact, mean anything at all."

বৃটিশ পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে সব মন্তব্য প্রকাশিত হয় সেগুলোও অত্যন্ত নৈরাশ্যকর। প্রখ্যাত Sunday Times-এ হামফ্রে কারপেন্টার লিখিত একটি রিভিউ-এর শিরোনাম ছিলঃ 'Mystic or Mistake'. হামফ্রে তাতে মন্তব্য করেন যে, রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার উপযুক্ত নন। কারণ তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য হামফ্রের

www.pathagar.com

ভাষায়ঃ "gooey, vaguely erotic pantheism." হামফ্রের মতে, রবীন্দ্রনাথ এক বিজ্ঞ অভিনেতার ভূমিকা পালন করেন। পাশ্চাত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার বর্ণনা করতে গিয়ে হাম্‌ফ্রে বলেনঃ "Tagore did for Yeats what Maharishi Mahesh (Yogi) was to do for the Beatles."

The Times পত্রিকায় 'The Wisest Fool in Calcutta" শিরোনামে P. N. Furbank রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখেনঃ "The authors use the words 'myriad minded' and 'colossus' about him, but those do not seem right, and belong to the unreal role Europe thrust upon him. One can hardly claim that, in any serious sense, Tagore was a thinker at all."

The Observer পত্রিকার Review কলামে রবীন্দ্রনাথকে "One of the most interesting cult figures of the 20th century"-এ দাবিকেই সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়। অবশ্য এর পাশাপাশি The Independent, Financial Times এবং Daily Telegraph পত্রিকাগুলো রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু ভাল কথা লেখেন। কিন্তু নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর পূর্বোল্লেখিত পত্রিকাগুলো রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যেসব কটূক্তি ও বিরূপ সমালোচনা করে তাতে পাশ্চাত্য বিশেষত ইংল্যান্ডে রবীন্দ্রনাথের ভাবমূর্তি দারুণভাবে বিনষ্ট হয়। তারা রবীন্দ্রনাথের এ বিশ্ব-সম্মান প্রাপ্তিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। অবশ্য তাদের এ নেতিবাচক মনোভাব কতটা সঙ্গত আর কতটা প্রভু-সুলভ প্রাচ্য-বিদ্বেষে পূর্ণ তা ভেবে দেখার অবকাশ আছে।

কৃষ্ণদত্ত এবং এনড্রিউ রবিনসন রচিত "Rabindranath Tagore: The Myrical-minded Man" নামক গ্রন্থে একটি চমকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনাটি ১৯১৩ সনের অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার বছর। ঐ সময় নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আনন্দে পুলকিত-অভিভূত রবীন্দ্রনাথ যখন তৃতীয় বারের মত তাঁর ইংল্যান্ড সফর সমাপ্ত করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের আয়োজন করছিলেন, তখন সেখানে তাঁর প্রখাত দুই বন্ধু-শুভাকাংক্ষী-শিল্পী উইলিয়ম রথেনস্টেইন ও কবি ইয়েট্‌স রবীন্দ্রনাথের সম্মানে এক নৈশ ভোজসভার আয়োজন করেন। আহারান্তে তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতারম' গানটি গাইতে অনুরোধ করেন। ঐ গানটি তখন বলতে গেলে, এক রকম হিন্দু-ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পেয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেও ছিলেন তার একজন প্রধান উদ্যোক্তা । হিন্দু-ভারতের কাছে ব্যাপক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এবং হিন্দু-ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদাপ্রাপ্ত এমন একটি গান রবীন্দ্রনাথ সেদিন স্বচ্ছন্দভাবে গাইতে না পারায়, উপস্থিত সকলেই নিরতিশয় বিস্ময়বোধ করেছিল।

কিন্তু দত্ত ও রবিনসনের বর্ণনা মতে, রবীন্দ্রনাথ ঐদিন ঐ গানটি গাওয়া শুরু করেন বটে তবে গানের শব্দগুলো ঠিক মত তাঁর স্মরণে না আসায় তিনি তা শেষ করতে

www.pathagar.com

পারলেন না । দত্ত ও রবিনসনের বর্ণনা এরূপ ঃ "Then in succession, Yeats attempted the Irish anthem, (the poet, Earnest) Rhys, the Welsh national anthem and Rothenstein 'God save the King.' Each stumbled"

ইংরেজ কবি ইয়েট্‌স রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী ভাষা-জ্ঞান সম্পর্কে যাই বলুন না কেন, রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী ভাষা রপ্ত করেছিলেন এবং ইংরেজী সাহিত্যের গভীর অনুরাগী পাঠক ছিলেন। ইংরেজী ছাড়াও তিনি ফারসী, হিন্দী, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা জানতেন। বাংলা ভাষায় প্রথম এবং সার্থকতম ছোটগল্প রচয়িতা হিসাবে তাঁর যে অসাধারণ কৃতিত্ব এবং বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে মনোবিশ্লেষণধর্মী নতুন ধারার উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন তার পেছনে তাঁর এ ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরক্তিকে বিশেষভাবে দায়ী করা চলে। অবশ্য এক্ষেত্রেও সমালোচকদের সমালোচনার তীক্ষ্ম ছুরি রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ কৃতিত্বকে কিছুটা ম্লান করে দিয়েছে। তাদের অকাট্য যুক্তি হলঃ রবীন্দ্রনাথের দু'একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এবং বেশ কিছু সংখ্যক শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প হুবহু ইংরেজী উপন্যাস ও ছোটগল্পের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ বা অনুসরণ। সমালোচকদের বড় অভিযোগ হলো, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঋণ কোথাও কোনভাবেই কখনো স্বীকার করেননি। ফলে অনেক সমালোচক তাঁকে চৌর্যবৃত্তির অপরাধে অপরাধী বলেও কঠোর সমালোচনা করেছেন। এ ধরনের অভিযোগ তাঁর কতিপয় কবিতার ক্ষেত্রেও উঠেছে। বলা হয়ে থাকে, তাঁর কিছু কিছু কবিতা বিশিষ্ট ইরানী কবি বিশেষত মহাকবি হাফিযের ফারসী কবিতার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রেও তাঁর ঋণ স্বীকারে কার্পণ্য করেছেন।

বড় কবিরাও অনেক সময় অন্য ভাষার ভাল কবিতার অনুবাদ করে থাকেন। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এসব কবিতা অনুবাদ বলে চালিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি কখনো এ সাধুতার পরিচয় দেননি। একজন বিশ্বমানের বড় প্রতিভার মূল্যায়নে এসব ক্ষুদ্র বিষয়ের অবতারণাও অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com